১৯১৩-২০১৩ 1913–2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১৯ জিলক্বদ, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ তাবুক, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ঈসাব্দ

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বিশ্বের ৯৭টি দেশের ৩৩০০০-এর অধিক লোকের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যের ৪৮তম সালানা জলসার সফল সমাপ্তি

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"

(বুখারী ও মুসলিম)।

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

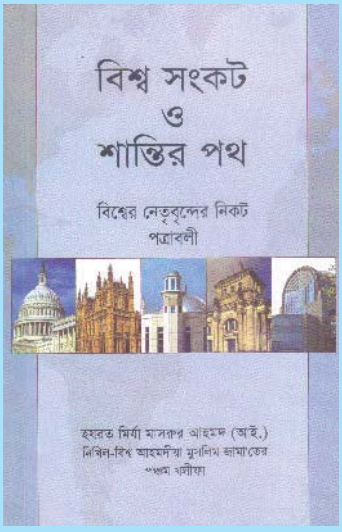

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণধারায় সিক্ত হলো প্রায় শত দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যের ৪৮তম সালানা জলসা

গত ২৯, ৩০ ও ৩১ আগষ্ট ২০১৪ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৪৮তম সালানা জলসা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত সফলতার সাথে হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বিনাসরিহিল আযীয-এর পবিত্র সত্তার উপস্থিতিতে এবং আশিসপূর্ণ দোয়ার মাধ্যমে তিনদিন ব্যাপী এই জলসার আধ্যাত্মিক কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! জলসার এই তিন দিন শুধু যুক্তরাজ্যেই নয় বরং সমগ্র আহমদী বিশ্বে বিশেষ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করছিল। এই তিন দিন যেন বিশেষ বরকত মন্ডিত দিনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এবারের জলসায় ৩৩ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ যোগদান করে নিজেদেরকে আশিষ মন্ডিত করেন। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার বরকত পেতে সারা বিশ্বের ২০৬টি দেশের লক্ষ-কোটি আহমদীরাও সম্পৃক্ত হোন। এবারের জলসায় ৯৭টি দেশ থেকে প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। এবারের জলসা ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর পূর্তির বিশেষ জলসা। জলসায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, এমপিসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে গত এক বছরে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষণ-ধারার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) তুলে ধরেন। তাঁর ভাষন থেকে স্পষ্ট হয় কিভাবে মহান আল্লাহ্ তা'লা এ জামা'তের উপর তাঁর কৃপাবারী বর্ষন করছেন। এবছর (১) বেলিস ও (২) ইউরিগুয়ে, এ দু'টি দেশে আহমদীয়া জামা'তের চারা রোপিত হয়। মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় সারা বিশ্বে গত এক বছরে ৫ লাখ ৫৫ হাজার ২৩৫ জন বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে।

এ জলসায় বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন বর্ণ ও ভাষা-ভাষী মানুষেরা স্ব-দেশের কৃষ্টি-কালচার নিয়ে উপস্থিত হলেও জলসায় মহা-মিলনের মোহনায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। আহমদীয়া জামা'তের সালানা জলসার এই দৃশ্য আচমকা কোন ঘটনা নয়। এ প্রসঙ্গে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালামের কাছে আল্লাহ্ তা'লা আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইলহামের মাধ্যমে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেনঃ ***ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক, ইয়াতুনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক*** অর্থাৎ যদিও এখন তুমি একা কিন্তু তোমার কাছে এমন যুগও আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দলে দলে লোক দূর দূরান্তের দেশ থেকে তোমার কাছে আসবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণী বড়ই শান ও শওকতের সাথে পূর্ণ হয়ে চলছে। চরম বিরোধিতা, নির্জলা মিথ্যারোপ ও চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদা তা'লা এ জামা'তকে প্রতি দিনই বাড়িয়ে চলছেন। জামা'ত একদিকে দিন দিন জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হচ্ছে অপর দিকে এর বিরোধীরা নাস্তানাবুদ হয়ে চলছে সর্বত্র।

বিশ্ব-মানবতার সুরক্ষায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) মহানবী (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে দিকদর্শী পথ-নির্দেশনা দান করে এই জলসায় যেমন বক্তব্য দান করেছেন, তেমনই মানবতার কল্যাণার্থে আন্তরিক মর্মবেদনা নিয়ে ইজতেমায়ী দোয়াও পরিচালনা করেছেন।

এক কথায় বলা যায়, এবারের জলসা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রভূত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়। ইসলাম আহমদীয়াতের এ তরী সর্বত্র সদা অগ্রসরমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ্!

সূচিপত্র

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ আগষ্ট, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা।**	৬
বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)	১৩
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর, ২০১২-এর **ঈদুল আযহার খুতবা।**	২০
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৮
অন্তকরণের হজ্জ ক'জন করে মাহমুদ আহমদ সুমন	৩১
দীর্ঘ জীবন লাভে মধুর উপকারিতা মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন	৩৩
নবীনদের পাতা- দোয়ার দ্বারা মানুষের হৃদয় তরতাজা হয় বুশরা মজিদ	৩৫
নবীনদের পাতা- বিনয়ী ও নম্র হোন, গীবত পরিহার করুন শারমিন আক্তার	৩৫
পাঠক কলাম- **"ইসলামে পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব"**	৩৬
সংবাদ	৪১
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৫
অত্যন্ত সফলতার সাথে যুক্তরাজ্যের ৪৮তম সালানা জলসা সমাপ্ত	৪৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٧﴾

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٨﴾

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٩﴾

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾

৩৭। সে বলল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাহলে সেদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাদের (অর্থাৎ মানুষদের) পুনরুত্থিত করা হবে[১৪৯৮]।'

৩৮। তিনি বললেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের একজন,

৩৯। নির্ধারিত সময়টি (এসে যাওয়ার) দিন পর্যন্ত[১৪৯৯]।

৪০। সে বলল, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করেছ তাই আমি নিশ্চয় তাদের জন্য পৃথিবীতে (জীবনকে) সুন্দর করে দেখাবো এবং আমি নিশ্চয় তাদের সবাইকে বিপথগামী করবো।

১৪৯৮। 'যেদিন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে' এই বাক্য দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বুঝানো হয়েছে, যখন নফ্‌সে মুতমাইন্না (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা) লাভ করে শয়তানী প্রলোভন এবং আধ্যাত্মিক পতন থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা এবং ইবলীসের মধ্যে এই বাক্যালাপ, যা এই আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, তা রূপক মাত্র।

১৪৯৯। 'নির্ধারিত সময়টি (এসে যাওয়া) দিন পর্যন্ত' অর্থাৎ (যেমনটি পূর্ববর্তী ৩৭ আয়াতে বর্ণিত) যখন নবীগণ ও তাঁদের অনুসারীরা শত্রুদের ওপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং মিথ্যা ও তার উপাসকবৃন্দ চরম ভাবে পরাজিত এবং নিষ্পেষিত হয়।

হাদীস শরীফ

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

কুরআন ঃ

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্বজগতকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তাআলা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী প্রেরণ করে তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয় বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে তাঁর কল্যাণের দ্বারা উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে অর্থাৎ যাঁর কল্যাণ দু'জগতেই সমভাবে মানবের কল্যাণ ঘটাবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তাআলা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার পাবেন তিনি হলেন, আমাদের নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তাআলা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকে দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর প্রতিফলক হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই অদ্বিতীয় বন্ধুর উপাসনা করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজের সত্তা নিজ মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের আবেগাকুল এক বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্তি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায় তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন : ***ইয়া কানাবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন*** অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই ***'বেলায়েত'*** (বন্ধুত্ব)।

এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায় ভাবে হত্যা না করাও বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। ***কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।*** (হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

জুমুআর খুতবা

অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না

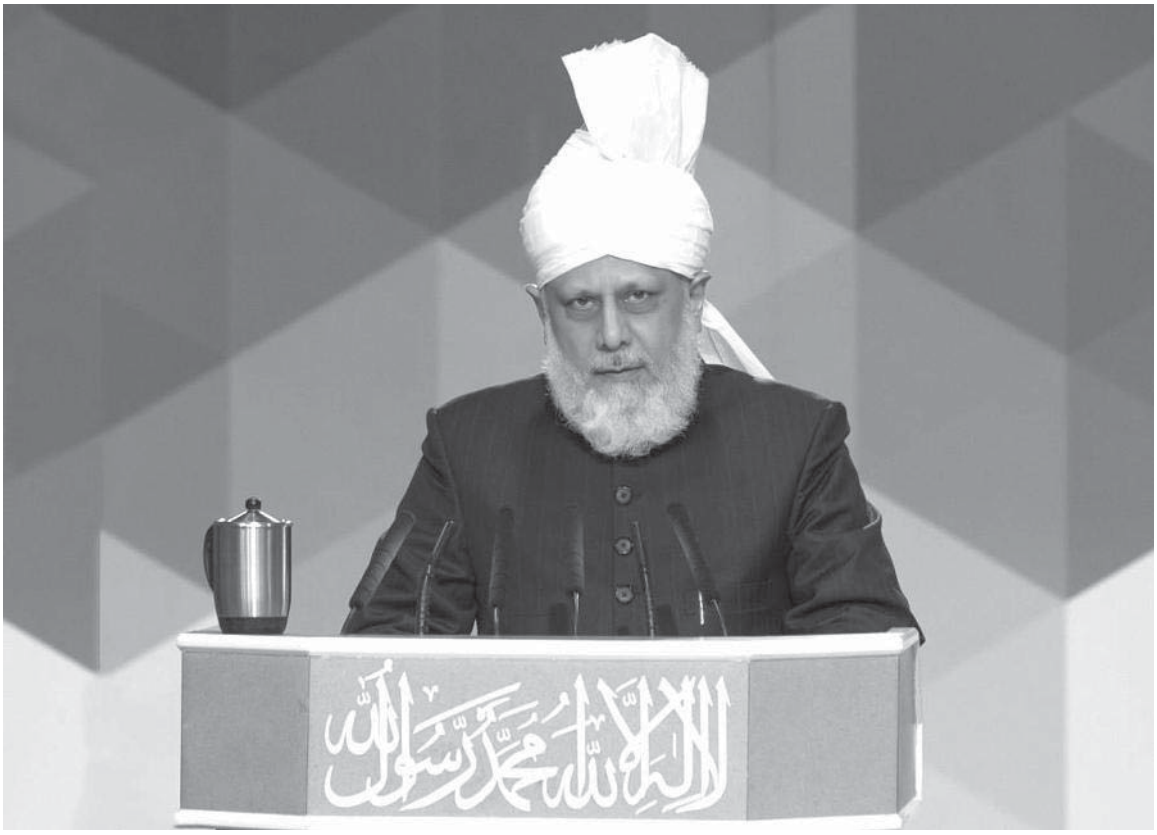

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ আগষ্ট, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

বার্ষিক জলসার খুতবাসমূহের পূর্বে আমি আল্লাহ্ তা'লার মু'মিন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বর্ণনা করছিলাম যে, তারা কারা যারা এথেকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণ পায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কথা অনুযায়ী আল্ মু'মিন বৈশিষ্ট্যের অধীনে একজন বিশ্বাসীর কিরূপ গুনাবলী থাকা প্রয়োজন যার পরে এক বান্দা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনে সেসব নিয়ামতের অংশীদার হবে। আজও আমি এ বিষয়ে বর্ণনা করবো।

আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের এ চিহ্ন বর্ণনা করেছেন যে, সে সৎকর্ম সম্পাদন করে। অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান থাকবে, তাঁর ফিরিশতাদের ওপর বিশ্বাস করবে, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখবে, তাঁর রসূলদের ওপর বিশ্বাস রাখবে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখবে

এবং যখন একজন মু'মিনের সম্মুখে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারিত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা তার হৃদয়ে ছেয়ে যাবে এবং এ ব্যাপারেও তার হৃদয় ভীত-কম্পিত যে, আমি কোথাও এমন কিছু না করে বসি যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন অবশ্যই সর্বদা তার হৃদয়ে এ ধারণা প্রাধান্য বিস্তার করবে যে, আমি সে কর্মই কর্ম যা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দনীয় কাজ, যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন, আল্লাহ্ তা'লা যার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং একজন মু'মিনকে এমন সৎকর্ম সম্পাদন করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি বান্দাদের অধিকারের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হবে। যদি এটি একজন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাহলে এটি তাকে সত্যিকার মু'মিনের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবে।

পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয় বর্ণনা করে এবং জামা'তের সদস্যদের মনযোগ আকর্ষন করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"তাঁর তৌহিদ জগতে প্রচার করতে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তার বান্দাদের প্রতি দয়া কর এবং তাদেরকে নিজ হস্ত বা জিহ্বা অথবা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারো প্রতি, সে তোমার অধিনস্ত হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যেন (খোদা তা'লার কাছে) গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এমন, যারা বাহ্যতঃ সহিষ্ণু কিন্তু অভ্যন্তরে নেকড়ে সদৃশ। আবার এমনও অনেকে আছে, যারা বাহ্যতঃ সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং তোমরা তার কাছে গ্রহণীয় হবে না, যে প্রর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশতঃ অবমাননা না করে তাকে সদুপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মাভিমানে দরিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ত্বাকওয়া অবলম্বন কর।" (লন্ডন থেকে প্রকাশিত-রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশতিয়ে নূহ-১১-১২ পৃষ্ঠা)

এ হলো সে কয়টি কথা, এগুলো সে কাজ যা সম্পাদন করার প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মনযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং তা সম্পাদনকারী নেক ও পূণ্যবান বিবেচিত হবে, এরা তারা যাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হবার জন্য শর্ত নির্ধারণ করেছেন। আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক, সে বিষয়ের ওপর ঈমান রাখি এবং এ বিশ্বাস রাখি যে, পরবর্তীদের মাঝে আগমনকারী মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাস ইনিই যার হাতে আমরা বয়আত করেছি। যার জামা'তে আমরা যোগদান করেছি, যিনি ত্বাকওয়ার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করে আমাদের কাছ থেকে সৎকর্ম সম্পাদনের প্রত্যাশা রাখেন, তাই আপন ঈমানের দৃঢ়তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রত্যেক আহমদীকে এসব বিষয়ের প্রতি মনযোগী হতে হবে, যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি।

প্রথম বিষয় যার প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছেন তা হলো, পৃথিবীতে তৌহিদ প্রচারের চেষ্টা, খোদা তা'লার ওপর বিশ্বাস কেবল এ বিষয়ের নাম নয় যে, আমরা আমাদের মুখ দ্বারা খোদা তা'লার ওপর নিজেদের ঈমান আনার ঘোষণা করে দিলাম অথবা বললাম যে, আমাদের হৃদয়ে খোদার ভয়-ভীতি রয়েছে বরং এর কার্যকরীরূপ দেখাতে হবে আর তা কি? তা হচ্ছে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তৌহিদ প্রতিষ্ঠার কার্যকরী প্রচেষ্টা তখনই হবে যখন আমরা সর্বপ্রথম আপন হৃদয়কে গায়রুল্লাহ্ থেকে পবিত্র করবো।

জাগতিক কামনা-বাসনার ছোট-খাট বিষয়কে নিজেদের অন্তর থেকে বের করে বাইরে নিক্ষেপ করবো। ব্যাক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য চাতুর্য ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করব। নামাযের ওপর নিজেদের কাজ-কর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্যকে প্রাধান্য না

"একজন মু'মিনকে এরূপ সৎকর্ম সম্পাদন করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের পাশাপাশি বান্দাদের অধিকারের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়।"

দিবে। খোদার সাথে নিজ সন্তানদের সম্পর্ক বন্ধনের জন্য নিজেদের কাজ ও কথা দ্বারা তাদের তরবিয়ত করবেন, তাদের জন্য আদর্শ স্থাপন না করবেন। আপন সমাজে খোদা তা'লার তৌহিদের চর্চা করবেন। সুতরাং যখন আমরা আমাদের পুরো শক্তি ও সামর্থ দিয়ে এগুলোর অনুশীলন করবো তখনই তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হবে আর তখনই আমরা আমাদের ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি করবো।

তারপর সৎকর্মের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "***সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হও***" কোন মু'মিন কেবল অন্য মু'মিনের ওপরেই নয় বরং কোন মানুষের ওপর হস্ত বা মুখ দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে যেন যুলুম না করে। মহানবী (সা.)-তো মু'মিনের এরূপ পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, সে-ই মু'মিন যার কাছ থেকে অন্যান্য সব মানুষ নিরাপদ থাকে । সুতরাং দয়াই মু'মিনের পরিচয়। যুলুমেরতো প্রশ্নই নেই। একজন মু'মিনের হৃদয়ে যখন সর্বদা অন্যের জন্য দয়া বিদ্যমান থাকবে তখনই সে রহ্মান খোদার ওপর সত্যিকার ঈমান আনার দাবী করতে পারবে, আর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক মু'মিন অপর মু'মিনের সাথে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় জড়িত।

তাই যখন সম্পর্কের এরূপ অবস্থা প্রত্যেক আহমদীর মাঝে সৃষ্টি হবে তখন নির্দয়তা এবং অত্যাচারের প্রশ্নই উঠতে পারে না, বরং অন্যের কষ্ট, সামান্য কষ্টকেও নিজের কষ্ট মনে হবে আর একজন আহমদীর চিন্তা-চেতনা এমনই হওয়া উচিত। তারপর তিনি (আ.) বলেন, "***মানবের কল্যাণার্থে চেষ্টা করতে থাক***।" যেভাবে আমি বলেছি, এক মু'মিন অপর মু'মিনের দু:খ-কষ্টকেও নিজের কষ্ট মনে করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মান অনেক উঁচু দেখতে চেয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, কেবল মু'মিনের কষ্টকে অনুভব করেই ক্ষান্ত হবে না বরং যখন অন্যের জন্য তোমাদের হৃদয়ে দয়ার চেতনা জাগ্রত হয় তখন একে আরো উন্নত করো। এ দয়ার চেতনাকে আপন হৃদয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখ না, কেবল সেখানেই যেন আবদ্ধ না থাকে বরং এর প্রকাশও যেন হয়। প্রকাশ কিভাবে হবে? বলা হয়েছে, এর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, "***আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির কল্যাণ কামানায় চেষ্টা করতে থাকা***।" মানুষকে কল্যাণ পৌঁছানোর জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হলেও করো। নিজ ঈমানের উন্নত মানের দৃষ্টান্ত দেখাও যা পূববর্তীরা দেখিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা যার উল্লেখ করেছেন, ***"ওয়া ইউসিরুনা আলা আনফুসিহী"*** (সূরা আল্ হাশ্‌র: ১০) এবং তারা স্বয়ং নিজেদের প্রাণের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করত।

মহানবী (সা.) নবুওয়াতের দাবীর পূর্বেও তাঁর পবিত্র স্বভাবের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন এবং এ আদর্শের ফলে অন্যের কল্যাণার্থে, অপরের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং 'হিলফুল্ ফুযুল' যা ইতিহাসে বর্ণিত একটি সংঘ ছিল তা এরই একটি সোপান। এবং নবুওয়াত লাভের পরে তো অন্যের প্রয়োজন পূরণার্থে তাদের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় তাঁর যে কর্ম ছিল আমরা তাঁর জীবনীতে প্রবল বর্ষণের ন্যায় এর দৃশ্য দেখতে পাই, আর এটিই তাঁর আদর্শ এবং পবিত্রকরণ শক্তি ছিল যা সাহাবীদের মাঝে এ চেতনা ফুৎকার করেছে, ফলে তারা একে অন্যের মঙ্গল কামনায় অগ্রগামী হয়েছে।

বর্তমান যুগে আমরা দেখি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে সৃষ্টির কল্যাণের সে দৃশ্য দেখিয়েছেন যা আমাদের জন্য অনুকরণযোগ্য এবং পথের দিশা। মহিলারা, শিশুরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে তাঁর (আ.) কাছে তাদের রোগের জন্য ঔষধ-পত্র নিতে আসতেন এবং তিনি (আ.) বিনা আপত্তিতে কয়েক ঘন্টা ধরে মানুষকে এ কল্যাণে আশিসমন্ডিত করেন আর বলেন, এরা দরিদ্র মানুষ, এ এলাকায় ডাক্তার নেই, এদের কাছে অর্থ নেই, খরচ করার সামর্থ নেই, তাই তাদের সাথে সহানুভূতির দাবী হচ্ছে, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা। তাঁর (আ.) সীমাহীন কাজ ছিল এবং সে যুগে একটি চতুর্মূখী লড়াই ছিল যা তিনি সব মিথ্যা ধর্মের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন কিন্তু সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এত বেশি প্রেরণা ছিল যে, এজন্য তিনি সময় বের করেছেন এবং ঘন্টার পর ঘন্টা এর পিছনে ব্যয় করেছেন।

তারপর আমার পঠিত এ উদ্ধৃতিতে তিনি আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেন যে, ***'কারো প্রতি, সে তোমার অধিনস্ত হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না'*** যদি আল্লাহ্ তা'লা কাউকে তোমার অধীনস্ত করেন, তোমাকে পর্যবেক্ষণ বানান তাহলে এ কারণে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যে, তোমাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ সরবরাহ করেছেন, অনেক মানুষকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। একজন মু'মিনের এটিই বৈশিষ্ট্য যে, যত বেশি তার ক্ষমতা বাড়ে তত বেশি তার বিনয়ী হওয়া উচিত। এত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হওয়া উচিত, সর্বদা স্মরণ রাখো যে, আমাদের প্রতিটি কর্ম সেরূপই থাকা উচিত যা আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অহংকার থেকে বাঁচার জন্য কি বলেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে:-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٩﴾

(সূরা লুক্‌মান:১৯) এবং তুমি মানুষের সম্মুখে অবজ্ঞা ভরে নিজের গাল ফুলিও না, এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সাথে বিচরণ করো না; কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অপছন্দ করেন যারা আত্মম্ভরি ও অহংকারী।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করতে চাইলে, যদি এ দাবী কর যে, আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে আমার হৃদয় ভীত হয় তাহলে সর্বপ্রকার অহংকার থেকে স্বয়ং নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। যদি তার অন্তরে সত্যিকার ঈমান থাকে তাহলে ক্ষমতাধর এবং সম্মানিত হওয়া একজন মু'মিনকে, বিনয় এবং কৃতজ্ঞতায় বর্ধিত করে।

মহানবী (সা.) চাকরদের আত্ম সম্মানের প্রতি এত বেশি দৃষ্টি রেখেছেন যে, বলেছেন; ***নিজেদের চাকরদেরকে 'আমার***

চাকর' বা 'আমার দাসী' নামে ডেকো না বরং আমার ছেলে আ মেয়ে নামে সম্বোধন কর।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে বলেন, *'কেউ গালি দিলেও তাকে গালি দিও না*। আর এটিই রহস্য যদ্বারা মু'মিনের মুখ সর্বদা পবিত্র থাকে। একজন মু'মিনকে সর্বদা পবিত্র কথা ব্যবহার করা উচিত। তার কাছ থেকে গালি প্রত্যাশাই করা যায় না। কারো গালি শুনে স্বয়ং নিজেকে দমন করা কেবল জিহবাকেই পবিত্র রাখে না বরং মস্তিষ্ককেও অনেক অন্যায় কাজ-কর্ম থেকে রক্ষা করে। গালি শুনে মানুষের প্রতিক্রিয়া এরূপই হয়ে থাকে যে, মানুষ রাগান্বিত হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপও যাকে গালি দেয়া হয়েছে বা ভালো-মন্দ বলা হয়েছে, সেও তদ্রূপ বাক্যই অন্যকে ফিরিয়ে দেয়।

সুতরাং যখন এরূপ সংকল্প হবে যে, অন্যের ব্যবহৃত নোংড়া বাক্যে উত্তর দিব না, কেননা, আল্লাহ্ তা'লা এরূপ করতে বারণ করেছেন। এটি অনেক বড় পূণ্য এবং এ পূণ্য অনেক বড় সংগ্রামের ফলে অর্জিত হবে। এটি সহজ কাজ নয়। এবং এ সংগ্রাম তখন পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না জন্মাবে আর সবদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অন্বেষি না হবে, তারপর এর মাধ্যমেই ধৈর্য্যের মান বৃদ্ধি পাবে।

একজন মু'মিনের জন্য এ নিশ্চয়তা রয়েছে যে, যদি কারো কুকথা বা বাক্য প্রয়োগ অথবা অন্যায় আক্রমনের ফলে ধৈর্য্য ধারণ কর তাহলে (তোমার পক্ষ থেকে) ফিরিশতা উত্তর দিবে। যখন আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাকে আমাদের জন্য ঢালস্বরূপ বানিয়েছেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দেয়ার জন্যও নিয়োগ করেছেন তাহলে এর থেকে উত্তম আর কি হতে পারে।

তারপর আল্লাহ্ তা'লা এ বাক্যে ধৈর্য্য ধারণকারীদের জন্য এর চেয়েও উত্তম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, *"ওয়া বাশ্‌শিরিছ ছাবিরিন"* এ শুভসংবাদ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শুনিয়েছেন। এরপরে বলেছেন, এসব মু'মিনদের প্রভুর পক্ষ থেকে যারা ধৈর্য্য ধারণ করে তাদের ওপর এ ধৈর্য্যের কারণে আশিস ও কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হবে। এবং প্রতিউত্তর না দেয়া কেবল একজন মু'মিন শুধু এজন্যই নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে এ নোংড়ামি থেকে রক্ষা করে বরং ফিরিশতাদের দোয়া থেকেও সে অংশ লাভ করে আর আল্লাহ্ তা'লার দয়াসমূহ ও করুণারাজিও সে অর্জন করে, তারপর সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীও হয়ে থাকে। ঝগড়া-ঝাটি এবং বিশৃঙ্খলার আধিক্য থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখে। গালির উত্তরে গালি দিলে অনেক সময় দ্বিতীয় পক্ষ আরো ক্রোধান্তিত হয়। অন্য পক্ষ্যের সমার্থকরাও ঐক্যবদ্ধ হয়। এ গালির ফলে অনেক সময় এমন ভয়াবহ বিবাদ আরম্ভ হয় যা হত্যা পর্যন্ত গড়ায়।

সুতরাং মু'মিনের অর্থই শান্তিতে বসবাসকারী এবং শান্তি বিস্তারকারী তাই তার কাছে এমন শান্তির প্রত্যাশাই করা যেতে পারে না যার ফলাফল ফিৎনা-ফাসাদ ভিত্তিক। যদি এরূপ ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচতে হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষ্য মতে এর চিকিৎসা হচ্ছে 'গালির উত্তরে গালি না দেয়া। বিনয়ী, সহিষ্ণু, সদুদ্দেশ্যপরায়ন হওয়া'।

তাই যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির নিয়্যতে এবং বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এ সবকিছু সহ্য করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সত্যিকার মু'মিন বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এরূপ অন্যান্য গুণাবলী ধারণকারী এবং মন্দ থেকে বাঁধা দানকারী যে সব বিষয় রয়েছে, এগুলোই মানুষকে, একজন মুসলমানকে একজন সত্যিকার মু'মিন বানিয়ে থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করতে থাকবে এবং নিজ ইবাদতের পাশাপাশি সৎকর্ম করতে থাকবে; যার মধ্য থেকে এখনই কয়েকটির বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলে সে প্রকৃত মু'মিন সাব্যস্ত হবে। নতুবা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি একজন মুসলমান খোদা তা'লা বর্ণিত এ বিষগুলোর ওপর মনযোগের সাথে আমল না করে তাহলে তার এমন বলা উচিত নয় যে, আমরা ঈমান এনেছি বরং আমাদের এখনও 'আসলামনা'র (ঈমান এনেছি) অবস্থা, অর্থাৎ আমরা বয়আত

"আমরা বিশ্বে তখনই সত্যিকার বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হবো যখন আমাদের ঈমান সে মানে উন্নতি করবে যাতে ইবাদতের মানও সমুন্নত করার চেষ্টা হবে।"

করেছি, কিছুটা আনুগত্য মেনে নিয়েছি, কিন্তু ঈমান পূর্ণতা পায়নি। কেননা সত্যিকার অর্থেই যদি হৃদয়ে ঈমান সৃষ্টি হতো তাহলেতো প্রত্যেকের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করার চেষ্টা দেখা যাওয়া উচিত।

বিশ্বে আমরা তখনই সত্যিকার বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হবো যখন আমাদের ঈমান সে মানে অধিষ্ঠিত হবে, যাতে ইবাদতের মানও সমুন্নত করা চেষ্টা করা হবে। আল্লাহ্ তা'লার ভয়ও হৃদয়ে সৃষ্টি হবে এবং সেজন্য চেষ্টা করা হবে। সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য একটি উদগ্র বাসনা হবে যা একজন মু'মিনের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং এসব বিষয়ের পাশাপাশি আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় রসূলের সত্যিকার মান্যকারীও হবো যারা পরম সৌভাগ্যে উপনীত হয়েছিল, অত্যন্ত উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যাদের নামাযসমূহ এবং সকল কর্ম ও ত্যাগ তিতিক্ষা সবই খোদার জন্য নিবেদিত ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের ওপর পরিচালিত হবার নির্দেশ দিয়েছেন তখন তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদেরকে তার ওপর চলার চেষ্টা করা উচিত।

সুতরাং যখন এ মান অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্মুখে অগ্রসর হবেন তখন আল্লাহ্ তা'লা এরূপ ঈমান আনয়নকারীদের সুখবর প্রদান করেন এবং বলেন যা এখনই আমি তেলাওয়াত করেছি। ***"ওয়া বাশ্‌শিরিল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালিহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহ্‌তিহাল আনহার"***

অর্থাৎ এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাদেরকে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় তাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকবে। ***"কুল্লামা রুযিকু মিনহা ছামারাতিন রিযকান ক্বালু হাযাল্লাযি রুযিকনা মিন ক্বাবলু ওয়া'তুবিহী মুতাশাবিহা"।***

অর্থাৎ যখন সেসব বাগান থেকে, সেসব জান্নাত থেকে যা পরকালের জান্নাত হতে তাদেরকে রিয্‌কস্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেয়া হবে, তারা বলবে, তো সে রিয্‌ক যা তাদেরকে এর পূর্বেও দেয়া হয়েছিল। ***"ওয়া'তুবিহী মুতাশাবিহা"*** বস্তুতঃ ইতোপূর্বে তাদের জন্য অনুরূপ রিয্‌ক দেয়া হয়েছিল এবং তাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়া সমূহ থাকবে ***"ওয়াহুম ফিহা খালিদুন"*** এবং তথায় তারা চিরকাল বাস করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:-

"যারা ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তারা সে বাগানের উত্তরাধিকারী হবে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে। এ আয়াতে ঈমানকে আল্লাহ্ তা'লা বাগানের সাথে সাদৃশ্য করেছেন আর সৎকর্মকে স্রোতস্বিনীর সাথে। প্রবাহিত নহর এবং গাছের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে সেরূপ সম্পর্কই রয়েছে ঈমান এবং সৎকর্মের মাঝে। সুতরাং যেভাবে পানি ছাড়া কোন বাগানের সবুজ শ্যামল এবং ফলবান থাকা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কোন ঈমান যার সাথে সৎকর্ম নেই তা উপকারী ও কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং বেহেশ্‌ত কি! তা ঈমান এবং সৎকর্মেরই মূর্তিমান রূপ, দোযখের ন্যায় কোন অস্থায়ী জিনিষ নয় বরং মানুষের বেহেশ্‌তও তার ভিতর থেকেই প্রস্ফুটিত হয়। স্মরণ রেখ! সে স্থানে যে আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয় তা সেই পবিত্র আত্মা যা পৃথিবীতেই বানানো হয়ে থাকে। পবিত্র ঈমান চাড়া গাছের সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং ভালো ভালো কর্ম, উন্নত গুণাবলী এ গাছের পরিচর্যার জন্য নহরের কাজ করে যা তার সবুজ-সতেজতাকে ধরে রাখে। এ বিশ্বেতো এগুলো এমনই যেভাবে স্বপ্নে দেখা যায় কিন্ত এ জগতে অনুভব ও চাক্ষুস করবে।"

তিনি (আ.) বলেছেন, "লেখা হয়েছে যে, এটিই কারণ; যখন বেহেশতবাসী এসব নেয়ামতে ভূষিত হবে তখন তারা বলবে, ***"হাযাল্লাযি রুযিকনা মিন ক্বাবলু ওয়া'তুবিহী মুতাশাবিহা"*** এর অর্থ এরূপ নয় যে, ইহজগতে যে দুধ বা মধু অথবা আঙ্গুর বা ডালিম ইত্যাদি যা আমরা খাই-পান করি সেগুলোই ওখানে পাওয়া যাবে। না; সেগুলো আপন বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই পুরোপুরি ভিন্ন

"সুতরাং এ চেতনা নিয়ে প্রত্যেক আহমদীকে নিজ ইবাদত করা উচিত, আর অন্যান্য কর্মও করা উচিত যাতে ঈমানে দৃঢ়তা সৃষ্টি হতে থাকে আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতরাজিরও উত্তরাধিকারী হতে থাকবে।"

হবে। হ্যা; কেবল নামের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যদিও এসব নেয়ামতের চিত্র বাহ্যিকভাবে দেখানো হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি বলে দেয়া হয়েছে যে, সেগুলো আত্মাকে জ্যোতির্ময় করে আর খোদার মা'রেফত (তত্বজ্ঞান) সৃষ্টিকারী।

এর উৎস আত্মা এবং খোদাভীতি। ***রুযিকনা মিন ক্বাবলু***'র এরূপ অর্থ করা যে, তা ইহজগতের বাহ্যিক নেয়ামতরাজি, একেবারেই ভুল বরং এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব মু'মিনরা সৎকর্ম করেছে, তারা নিজের হাতে একটি বেহেশ্‌ত নির্মাণ করেছে, যার ফল তারা ঐ পরজগতেও খাবে এবং সে ফল যেহেতু আধ্যাত্মিকভাবে এ জগতেও খেয়েছে তাই সে জগতে তা শনাক্ত করতে পারবে আর বলবে, এতো সেই ফল বলে মনে হচ্ছে, এ সেই আধ্যাত্মিক উন্নতিসমূহ যা পৃথিবীতে হতে থাকে, তাই সে তত্বজ্ঞানী বান্দা এগুলোকে শনাক্ত করতে পারবে। আমি পুনরায় স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, জাহান্নাম এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে একটি দর্শন রয়েছে যা পারস্পরিক সম্পর্ক সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় যা এখনই আমি বলেছি।" (মলফুযাত-৩য় খন্ড,২৫-৩০ পৃষ্ঠা)

সুতরাং কর্মের এই চির সবুজ অবস্থা সে সময়ই প্রতিষ্ঠা হবে যখন সৎকর্ম সম্পাদন করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশবলীর ওপর পরিচালিত হয়ে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকবো। তাই মু'মিনদের জন্য কেবল পরজগতেই এ সুসংবাদ দেয়া হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের ঈমানকে দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে এ জগতেও সৎকর্মশীলদের এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টাকারীদের এ ফল-ফলাদীর স্বাদ গ্রহণ করায়, সে ফল-ফলাদী দেখায় যা দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যমও হয়ে থাকে। একজন মু'মিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণে তার হৃদয় প্রশান্ত এবং স্বল্পে তুষ্ট হয়, যা তার অন্তরে বিদ্যমান থাকে। এটিও সেসব ফলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

ধর্মীয় এবং জাগতিক নিয়ামতও একজন মু'মিন এ জগতে লাভ করে আর এ জাগতিক নেয়ামতরাজি তার উদ্দেশ্য হয় না বরং একজন মু'মিন খোদার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ সম্পাদন করে তার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে তা দান করেন। সুতরাং সৎকর্ম তখনই হবে যখন খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে তা সম্পাদন করা হবে। নতুবা আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, এরূপ নামাযীর নামায তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয় যদিও নামায আদায় করা পূণ্য কাজ। অনুরূপভাবে অনেকে বিভিন্ন সময় যথেষ্ট খরচ করে কিন্তু তাদের মধ্যে ঈমান নেই। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করে না বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে, তাই সে কাজ তাদের কোন উপকারে আসে না।

এক ব্যক্তি, এক ইহুদী কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বৃষ্টির মধ্যে জীব-জন্তুকে খাবার দিচ্ছিল, ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ পুরষ্কার দিয়েছেন তাই সে ঈমান আনার তৌফিক পেয়েছে, তাই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কাজ করা হবে তা ঈমানও বৃদ্ধি করে। ঈমানও দান করেন আর এ জগতেও আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারীও বানান আর পরকালেও। সুতরাং যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, গাছের সতেজতার জন্য যেভাবে পানি আবশ্যকীয় অনুরূপভাবে ঈমানের দৃঢ়তা ও সতেজতার জন্য সৎকর্ম অত্যাবশ্যক।

খোদা তা'লা বর্ণিত সেসব পূণ্যকর্ম সম্পাদন আবশ্যক। যা তার সন্তোষভাজন হবার জন্য এবং ঈমান বৃদ্ধি করার জন্য। সুতরাং এ চেতনার সাথে প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের ইবাদত এবং অন্যান্য সৎকর্মও সম্পাদন করা উচিত, যাতে ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হতে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা এ চেতনার নিয়ে প্রত্যেক আহমদীকে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিন।

সানী খুতবার সময় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এখন জুমুআর নামাযের পর আমি দু'টি গায়েবানা জানাযা নামায পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্। একজন হচ্ছেন, আমার খালা এবং হযরত উম্মে নাসের, গর্ভজাত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মেয়ে সাহেবজাদী আমাতুল আযীয বেগম সাহেবা। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.)-এর পুত্র বধু এবং মির্যা

আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করতে চাইলে, যদি এ দাবী কর যে, আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে আমার হৃদয় ভীত হয় তাহলে সর্বপ্রকার অহংকার থেকে স্বয়ং নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। যদি তার অন্তরে সত্যিকার ঈমান থাকে তাহলে ক্ষমতাধর এবং সম্মানিত হওয়া একজন মু'মিনকে, বিনয় এবং কৃতজ্ঞতায় বর্ধিত করে।

হামীদ আহমদ সাহেবের পত্নী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন তাঁর সন্তানদের আমীন লিখেন, হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) শিশুকালে তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'আযীযা স্নেহের সবচেয়ে ছোট পূণ্যবতী' (এ আমীনের একটি পঙক্তি)

অত্যন্ত ধৈর্য্যশীলা ছিলেন, খোদার ভরসায় উন্নত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূণ্যবতী ছিলেন, মিশুক ছিলেন, অত্যন্ত দোয়াকারিনী ছিলেন, কায়োমনোবাক্যে অত্যন্ত মনযোগের সাথে নামায আদায় করতেন, তাঁর নামায অনেক দীর্ঘ হতো, কয়েক ঘন্টা ধরে মাগরিবের নামায ইশা পর্যন্ত এবং ইশার নামায পরবর্তী কয়েক ঘন্টা যাবত আমি তাঁকে পড়তে দেখেছি, এবং এটি দৈনন্দিন রীতি ছিল। আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত দোয়াগো, দরিদ্রদের সেবাকরীরি নারী ছিলেন। খেলাফতের সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আমাকেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পত্র লিখতেন। জামা'তীভাবে প্রথমে সতের বছর লাজনা ইমাইল্লাহ্ লাহোরের নায়েব সদর ছিলেন, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ লাহোরের সদর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্‌র ফযলে লাহোরের লাজনাদের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় একটি সবুজ কোট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পরিধান করতেন এবং এখন আমি পরিধান করি। এ কোট হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের পক্ষ থেকে তাঁর স্বামী সাহেবজাদা মির্যা হামীদ আহমদ সাহেবের অংশে এসেছিল। যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এখানে হিজরত করেন তখন এ কোট তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে প্রদান করেন যে, আপনি যতদিন সেখানে থাকবেন আর আপনি যখনই এ কোট পরিধান করবেন আমার জন্যও দোয়া করবেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জীবদ্দশায়ই মির্যা হামীদ সাহেব মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সাহেবজাদী আমাতুল হাফিজ সাহেব এ কোট দিয়ে দেন। তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর তিরোধানের পর আমি তাঁকে বলেছি, এ কোট আপনাকে আমানত স্বরূপ দিয়েছিলেন, তখন তিনি আমাকে তাঁর মেয়েদের সাথে আলাপ করে আমাকে লিখে দিয়েছিলেন যে, এ কোট এখন আন্তর্জাতিক বয়আতের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে, তাই আমরা এটি খেলাফতকে দান করছি এবং তারা খেলাফতের জন্য এ তাবাররুক দিয়ে দিয়েছেন। জামা'তেরও উচিত তাদের জন্য দোয়া করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি তাবাররুক। সামান্য ছোট্ট কাপড়ও কেউ দেয় না, অনেক ত্যাগ করে এ কোট দিয়েছেন।

তাঁর তিনজন কন্যা রয়েছে। একজন হযরত সওয়াব আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবার ছেলে লাহোর নিবাসী মোস্তফা খান সাহেবের স্ত্রী। দ্বিতীয়জন রাবোয়ার ডাক্তার মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের স্ত্রী আর তৃতীয়জন কাওসার হামীদ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও এসব পূণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন যা তাঁর মাঝে ছিল।

দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, মুরব্বী সিলসিলাহ্ মালেক সাঈদ আহমদ রশীদ সাহেবের স্ত্রী'র। তার নানা, দাদা, এবং বড় আব্বা সবাই সাহাবী ছিলেন। কপুরথলার আব্দুস সামী সাহেব নাতী ছিলেন এবং মুনশী আব্দুর রহমান সাহেবের প্রপৌত্রি ছিলেন। এছাড়া ওয়াকফে যিন্দেগীর সহধর্মীনি হবার সুবাদে লাজনাদের মাঝে তার যথেষ্ট সেবা রয়েছে। রাজনা হোমীও ক্লিনিক তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন এবং নিজের অসুস্থতা সত্বেও অত্যন্ত সাহস ও পরিশ্রমের সাথে কাজ করে গেছেন। তার ৪৯ বছর বয়স ছিল। এ বয়সে তিনি মারা যান। তাদের সন্তানাদী রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সন্তানদের ধৈর্য্য দিন এবং বাচ্চাদের জন্য তার দোয়া কবুল করুন। সর্বদা তাদের হাফেজ ও নাসের হোন।

[হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)]

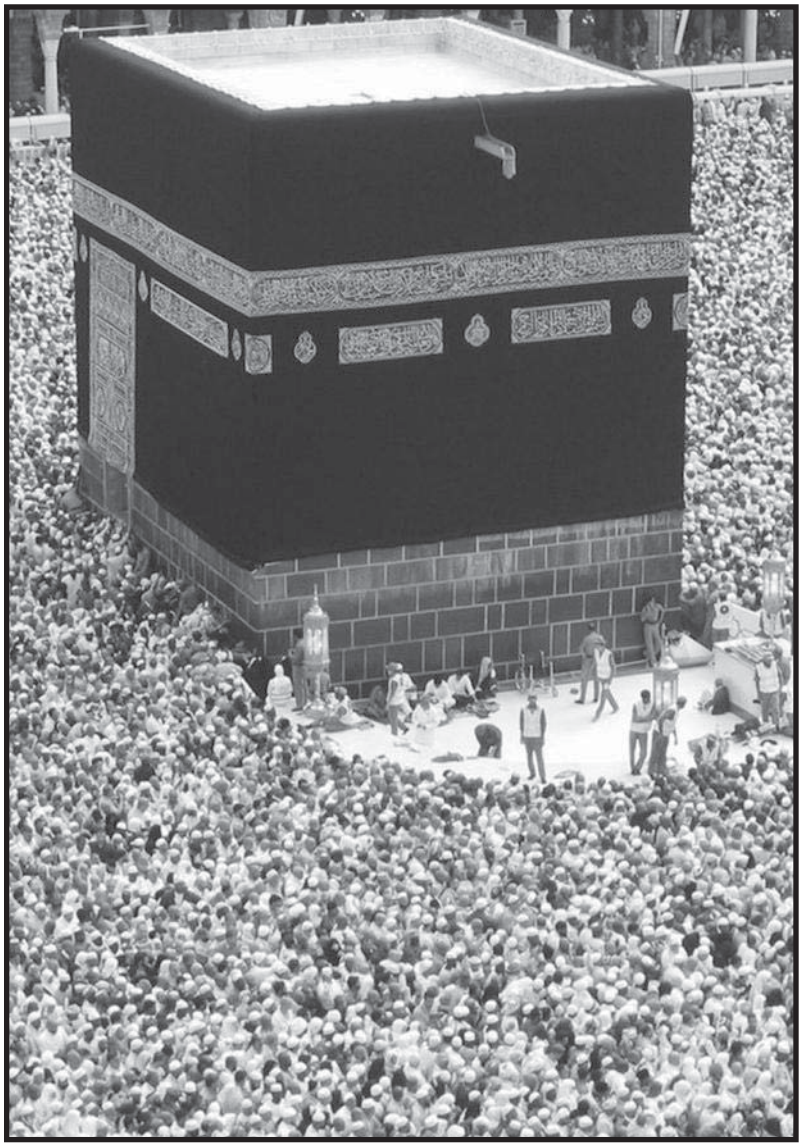

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান

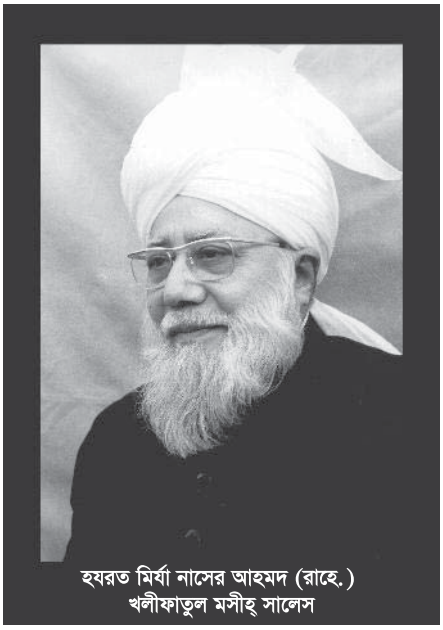

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۷﴾

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۶﴾

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ ﴿۹۷﴾
فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾

(সূরা আলে ইমরান: ৯৭-৯৮)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ع

(সূরা বাকারা: ১২৬-১৩০)

এরপর হুযূর (রাহে.) বলেন,

আমি একান্তই এক জরুরী বিষয়ের ওপর একাধিক খুতবা প্রদান করেছি যার সংক্ষিপ্ত সার হলো– আল্লাহ্ তা'লাই গোটা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য একটি ঘর বানিয়েছিলেন কিন্তু তারা এর বিশালত্বকে শনাক্ত করতে পারে নাই। ফল এই দাঁড়ালো যে সে ঘর নষ্ট হয়ে গেল এমন কি এর নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহপূর্ণ বাণী দ্বারা পুণরায় সেই গৃহের ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন নির্দেশিত করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে একে নবরূপে নির্মাণ করালেন আর এর সুরক্ষার জন্য ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়েছেন যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে ওই পবিত্র গৃহের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে তার (আ.) বংশধরেরা এক সুদীর্ঘকাল এর সেবায় নিয়োজিত রইলো। দু'হাজার পাঁচশ' বছর ধরে সেবা ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জাতি পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ করলো আর বিশ্বজোড়া সার্বজনীন শরীয়তের দায়িত্বসমূহকে অসহায়ত্বের কবল থেকে রক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজ মাঝে ধারণ করলো।

আমি আরও বলেছিলাম– এ আয়াতে যা আমি তেলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা ওই তেইশটি মহান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যার সম্পর্ক বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সাথে রয়েছে আর ওই যাবতীয় লক্ষ্যের অর্জন নবী করীম (সা.) এর আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত। ওই উদ্দেশ্যাবলী থেকে পাঁচটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি গত খুতবায়– আপনারা, যারা আমার প্রিয়জন তাদের সামনে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধি বর্ণনা করেছি।

প্রথমত- এই যে ঘর ***'উযিয়ালিন্নাস'***- গোটা মানবজাতির কল্যাণার্থে নির্মাণ করা হচ্ছে, দ্বিতীয়ত ***'মুবারাকান'***- এর মাঝে মুবারক (কল্যাণমন্ডিত) হওয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়- বাহ্যিকভাবেও আর আধ্যত্মিক দৃষ্টিকোণেও, তৃতীয়ত এই যে ***'হুদাল্লিল আলামীন'***- এ সমগ্র জগতের জন্য আমরা একে হেদায়াত-এর কারণ ও উৎসস্থল বানাতে চাই আর জীবন চলার পথে হেদায়াত-এর অন্তর্নিহিত সব অর্থে একে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বজগতের জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানিয়েছেন, চতুর্থত এই যে, ***'ফিহি আইয়্যাতিম্ বাইয়্যিনাত'*** অর্থাৎ ঐশী নিদর্শনাবলীর এমন ধারাবাহিকতা এ-স্থান থেকে জারী রাখা হবে যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত সজীব থাকবে আর ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের এমন ফল্গুধারা উৎসারিত হবে যা কখনও নিঃশেষিত হবে না। আর পঞ্চমত ***'মাকামু ইব্রাহীম'*** বাক্যাংশ এটা প্রকাশ করছে যে ওই ইবাদত যা প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা ও মায়ামমতার ভিতের ওপর গড়ে তোলা হবে, সেই ইবাদতের কেন্দ্রভূমি হবে এটি আর ভবিষ্যতে সকল যুগের সকল জাতির প্রতিনিধিত্বশীল এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটানো হবে যারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে পাপমুক্ত হয়ে তাঁর (আল্লাহ্ তা'লার) ভালোবাসায় মস্তকাবনত হয়ে থাকবে আর আল্লাহ তা'লার নৈকট্যপূর্ণ সান্নিধ্যের দুয়ার তাদের জন্য চিরতরে উন্মুক্ত করে রাখা হবে।

এই ***পাঁচটি উদ্দেশ্য,*** যেগুলো সম্পর্কে আমি গত জুমুআর খুতবায় বিশদভাবে

বায়তুল্লাহকে সুরক্ষা দিতে আর এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে খোদার পবিত্র গৃহের সেবায় উৎসর্গ করেন।

বর্ণনা করেছিলাম। কারণ আমাকে ওই উদ্দেশ্যসমূহের প্রত্যেকটির বিষয়ে পূনর্বার আলোচনায় আসতে হবে, এটা সাব্যস্ত করার জন্য যে ওর প্রত্যেকটিরই সম্পর্ক রয়েছে নবী করীম (সা.) এর আবির্ভাবের সাথে, আর সেই সাথে এটাও উল্লেখ করতে যে সেই উদ্দেশ্য কীভাবে আর কেমন উচ্চ মর্যাদার সাথে অর্জিত হয়েছে। এজন্য আজ আমার ইচ্ছা এই যে আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেই উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করি আর চেষ্টা করবো যে ঐ তেইশটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যেগুলোর বর্ণনা অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেগুলো আজকের খুতবায় বর্ণনা করব, যতটা আল্লাহ্ তা'লা চান ।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***"ওয়ামান দাখালাহূ কানা আমিনান"***– এটা হল বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ***ষষ্ঠ উদ্দেশ্য***। যে কেউ এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐরূপ ইবাদত করবে যার সম্পর্ক বায়তুল্লাহ্‌র সাথে রয়েছে সে ইহজগতের ও পরকালের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে খোদার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাবে এবং তার অতীতের সব গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতএব বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার জন্য এমন এক গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া যার সাথে অন্যান্য ইবাদতকর্মও সম্পর্ক রাখে। আর যে কেউই একাগ্রতাপূর্ণ ইচ্ছার সাথে ও পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণরূপে উপাসনা পালন করবে তাদের ব্যাপারেই এখানে আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে আর দোযখের আগুন থেকে তারা সুরক্ষা লাভ করবে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ***সপ্তম উদ্দেশ্য*** আল্লাহ্ তা'লা এখানে এটা জানিয়েছেন যে ***"ওয়া লিল্লাহি আলান্ নাসি হিজ্জুল বাইতি"*** হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধরেরা কিংবা কেবল আরববাসীদের ওপরই এটা ফরয নয় যে তারা বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করুক বরং বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটা যে জগতের সবজাতি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করার জন্য এই পবিত্র ভূমিতে সমবেত হোক [আমি মনে করি যে এসব উদ্দেশ্যাবলী হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সময়েই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। যেমনটা কুরআন করীমে কুরাইশ জাতির কর্মোদ্দীপনার ব্যাপারে বহু উল্লেখ পাওয়া যায়]। যাহোক আল্লাহ্ তা'লাই হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে এটা জানিয়েছেন যে, 'এটা খোদা তা'লার এমন একটা ঘর যে, বিশ্বের সব জাতি যারা আমার ওপর ঈমান আনবে আমার রসূল (সা.)-এর ওপরও ঈমান রাখবে এবং খাতামান নবীঈন (সা.)-এর হাতে হাত রেখে আমার আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে তুলে নিবে তাদের জন্য বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরযরূপে (বাধ্যতামূলক) নির্ধারণ করে দেয়া হবে। আর এভাবে সেই স্থানকে সৃষ্টির প্রত্যাবর্তন স্থল এবং জগতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে দেয়া হবে'।

অষ্টম উদ্দেশ্য অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের অষ্টম উদ্দেশ্যরূপে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল ***'মাছাবাতান'*** (বার বার মিলিত হওয়ার স্থান)- এই শব্দে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বিশ্বের জাতিগুলো দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে আর যে যুগে এই বিভক্তি চরম রূপ ধারণ করবে সে যুগে এমন এক রসূল প্রেরিত হবেন যিনি বায়তুল্লাহ্‌র এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতাদানকারী হবেন আর বিভাজিত জাতিসমূহ, দল ও উপদলগুলোকে একই কেন্দ্রে এনে একতাবদ্ধ করবেন। তিনি সবাইকে ***'আলা দিনিওঁ ওয়াহিদিন'***-এ নিয়ে আসবেন। অতএব এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে যে একযুগে বিভাজন যখন চরমে পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা এটাই যে সেই যুগে এমন এক রসূল পাঠান যিনি সবজাতিসমূহকে ***'উম্মতাওঁ ওয়াহিদাতুন'*** বানিয়ে দেন।

নবম উদ্দেশ্য 'আমনান' বলা হয়েছে– এটা অর্থাৎ এটাই হলো সেই ঘর যা ***'আমনান লিন্নাস'***- এখানে এর অর্থ হল যে, আমরাই নিজেদের এই ঘরকে এমন বানাতে চেয়েছিলাম যে এর মাধ্যমে এবং শুধু এরই দ্বারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য লাভ হবে। কারণ কেবল এটিই এক ঘর যাকে ***বায়তুল্লাহ্*** আখ্যায়িত করা যায়, একে পরিত্যাগ করে এর শিক্ষাকে অবমূল্যায়ণ করে, যার সম্পর্ক এই ঘরের সাথে রয়েছে, বিশ্বের যে কোন সংস্থা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, তারা কখনই এতে সফল হবে না। বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল সে সময় আর কেবলমাত্র সেই শিক্ষার উপরই আমল করার ফলে লাভ হতে পারে, যে শিক্ষা সেই মহান নবী জগতসমক্ষে উপস্থাপন করবেন আর যার উত্থান ঘটানো হবে পবিত্র কাবাগৃহ থেকেই।

'আমান' অপর এক মর্মার্থানুযায়ী ***'আমনান লিন্নাস'***- এর অর্থ এটাও যে, আধ্যাত্মিকভাবে জগদ্বাসীর অন্তরের স্বস্তি শুধুই পবিত্র মক্কা আর শুধু সেই শেষ শরীয়তের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করার ফলে অর্জিত হতে পারে যা শেষ শরীয়ত মক্কায় প্রকাশিত হবে আর বিশ্বের সকল জাতিকে ডেকে ডেকে তাদের নিজেদের প্রভূ প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করতে থাকবে। আর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বস্তি ঐ সময়ে লাভ হতে পারে যখন তার স্বভাবজ ও প্রকৃতিগত চাহিদাগুলোকে সেই সুশিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে গড়ে নিতে সক্ষম হয় আর আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে যত রকম শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর লালন-পালন ও পরিপোষণ করতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ শিক্ষাদানের একটাই ঘর হবে– ***'মক্কা'***, যা সত্যিকারভাবে জগতের অন্তরে স্বস্তিদানকারী অর্থাৎ উভয় অর্থ এখানে প্রযোজ্য হয়–এক তো হল এই যে, যদি বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য পেতে চায় তবে তা মক্কার বদৌলতে । দ্বিতীয়ত এটা যে, বিশ্ববাসী যদি অন্তরের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে চায়, নিরুদ্বেগ ও উৎকণ্ঠামুক্ত বিশ্ব পেতে চায় তাহলে তাও কেবল ঐ পবিত্র শিক্ষা লাভের ফলেই সম্ভব, যা মক্কায় অবতীর্ণ হবে।

পবিত্র কাবা গৃহ নির্মাণের ***দশম উদ্দেশ্য*** ও লক্ষ্য এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন যে ***'ইত্তাখেজু মিম মা'ক্বামি ইব্রাহিমা মুসাল্লা'***। পূর্বের এক আয়াতে 'মাকামু ইব্রাহীম'এর উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে বুঝা যায় যে, এই আবাসস্থল এমন এক গৃহ, যে স্থানে সত্য ও চিরন্তন

ইবাদতের ভিত্তি রাখা হয়েছিল–যা পরম উপাস্যের সাথে গভীর ভালোবাসা আর প্রেমাস্পদের প্রতি বিনীত আত্মসমর্পণের ঝর্ণা থেকে উৎসারিত। ***'ওয়াত্তাখিযু মিম্ মাক্বামি ইব্রাহীমা মুসা'ল্লা'***য় সেই ইবাদতের উল্লেখ রয়েছে যা অনুতাপ আর বিনয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে প্রকাশিত হয়। আসলে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন যে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের এক উদ্দেশ্য, এমন এক জাতির জন্ম দেয়া–যারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েও বিনয়ের সাথে নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে বিনীত ইবাদতের ক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠিত করুক এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিতকারী হোক।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ***এগারোতম উদ্দেশ্য*** বর্ণিত হয়েছে এটা যে ***'ত্বোয়াহ্হিরা বাইতিয়া'*** আর এতে আমাদেরকে এটা শিখানো হয়েছে যে এটা আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে এই পবিত্র কাবাগৃহ শিক্ষালয়স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে একে গোটা দুনিয়ার জন্য এক শিক্ষা কেন্দ্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

কাবাগৃহ নির্মাণের ***বারোতম উদ্দেশ্য*** এটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে ***'লিত্ত্বোয়া-ইফীনা'*** অর্থাৎ জাতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ বার বার এখানে এসে সমবেত হতে থাকবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতিনিধিরা বার বার এখানে তাওয়াফ করতে আসতে থাকবে, আর সেই সব উদ্দেশ্যকে পুরা করার জন্যও আসবে যেগুলো পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পর্ক রাখে।

তেরোতম উদ্দেশ্য এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে ***'ওয়াল আকিফীনা'*** এ উদ্দেশ্যের কারণেই পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে নির্মাণ করা হচ্ছে যে এর মাধ্যমে এমন এক জাতি সৃষ্টি করা হোক যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গকারী হয় আর তেমনি ভাবে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণকারীও হয়।

চৌদ্দতম উদ্দেশ্য এখানে এই বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন যে, ***'ওয়াররুক্কায়িস্ সুজূদ'*** এমন এক জাতি সৃষ্টি করা হোক যারা মহান সৃষ্টিকর্তার একত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর যারা আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও নির্দেশ মান্যকারী হয়ে নিজ জীবন কাটিয়ে দেয়।

পনেরতম উদ্দেশ্য এটা বর্ণিত হয়েছে যে ***'বালাদান আমিনান'***। ***'আমান'*** শব্দটি এই আয়াতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে আমরা এই ঘরকে দুনিয়ার অত্যাচারমূলক আক্রমণ থেকে স্বীয় নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ে রাখবো আর এমন কোন হামলা যা পবিত্র কাবা গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হবে তাতে তারা সফলকাম হবে না বরং আক্রমণকারীদের এমনভাবে ধ্বংস করা হবে যে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যাতে এ থেকে জগত এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে সেই নবী– যাকে আমরা এখানে আবির্ভূত করতে চাই সে-ও খোদা তা'লার নিরাপদ আশ্রয়েই থাকবে আর জগতের কোন শক্তি তাকে (নবীকে) বধ করতে বা তার মিশনকে নিষ্ফল করতে সক্ষম হবে না আর এ থেকে জগত এই শিক্ষা লাভ করবে যে নিষ্পাপ নবীকে যে শরীয়ত দেয়া হয় তা চিরন্তনরূপেই তাকে দেয়া হয় আর তার হেফাযতের দায়িত্বে স্বয়ং খোদা তা'লাই থাকেন।

ষোলতম উদ্দেশ্য যা পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পৃক্ত তা হল ***'ওয়ারযুক্ব আহ্লাহু মিনাস সামারাতি'***। এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, 'আমি নবরূপে বায়তুল্লাহ্কে পূর্ণনির্মাণ করাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল্লাহ্র কল্যাণসমূহ দর্শন করে জগত যাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে খোদা তা'লার পথে যে সব লোকেরা মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁরই হয়ে তাঁরই রাস্তায় কুরবানী দিতে থাকে আর পার্থিবতা থেকে

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণকালেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

পবিত্র কাবাগৃহ ধ্বংস করতে যে কোন হামলা বা এমন যা-ই কিছু করা হবে, তা ব্যর্থ হবে।

মুক্ত হয়ে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত হয়ে যায় তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয় না বরং প্রেমাস্পদের দেয়া মিষ্টিমধুর ফল তাদের লাভ হয় আর বিনম্র প্রেমানুরাগপূর্ণ আমলের সর্বোত্তম ফল লাভ করা তাদের জন্য অবধারিত এক নিয়তিতে পরিণত হয়'।

বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার ***সতেরতম উদ্দেশ্য***–এটা জানানো হয়েছে যে, ***'রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না'***– এটি বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য যাতে জগত জানতে পারে আর উপলব্ধি করতে পারে যে দোয়ার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লাভ করা সম্ভব। দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে মানুষ যখন আত্মবিলীনতা লাভ করে মৃতের ন্যায় হয়ে যায় তখন আকাশ থেকে ঐশী অনুগ্রহের অবতরণ ঘটে আর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথসমূহ বান্দার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ আয়াতের এ অংশেও আল্লাহ্ তা'লা বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে এই স্থানে (মক্কায়) এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা যাবতীয় শর্তাবলী পালন করা সহ দোয়াকারী হবে। তারা দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে 'মৃত' সদৃশ এক অবস্থায় নিজ সত্ত্বা পরিপূর্ণরূপে হারিয়ে বিগলিত এক ধারায় প্রভূ-প্রতিপালকের আস্তানায় বয়ে চলবে আর তারা উপলব্ধি করবে যে আমরা নিজেদের আমলের ফল হিসাবে (প্রকৃতপক্ষে ফল হিসাবে নয়) কিছুই অর্জন করতে সক্ষম নই যতক্ষণ আমরা দোয়ার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ না করছি আর তার জন্য অসাধারণ কুরবানীসমূহ দেয়ার পরও তারা নিজেদের কুরবানীসমূহকে সামান্যতম মূল্যবান কোন কিছুই মনে করে না বরং সর্বক্ষণ নিজেদের প্রভূ-প্রতিপালকের সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত থাকে আর অগণিত কুরবানী প্রদান করা সত্ত্বেও তাদের দোয়া এটাই হবে যে, আমরা তোমার সমীপে যা কিছু নিবেদন করছি তা এক নগণ্য উপহার, তোমার মর্যাদা সুমহান ও সুউচ্চ আর আমরা মনে করি যে তোমার কাছে আমাদের পেশকৃত এ উপহার গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু সদাশয় তুমি কৃপাকারী প্রভূ-প্রতিপালক! আমাদের নগন্য এ উপহার তুমি গ্রহণ কর আর আমাদের দূর্বলতাসমূহ আমাদের মন্দ কার্যসমূহকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ আর দয়া ও মমতার উপকরণ সৃষ্টি কর যাতে আমরা স্বভাব চরিত্রে আর সাধ্য সাধনায় তোমার কাছে গ্রহণীয় হয়ে যাই, মোট কথা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতির উদ্ভব ঘটাতেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত রেখেছিলেন।

আঠারতম উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুণর্নির্মাণের উদ্দেশ্য হল যে, জগত জানুক–খোদা তা'লার সমীপে যেসব লোকেরা এমনিভাবে দোয়ারত থাকে, তারাই নিজ প্রভু প্রতিপালকের ***'সামিউন'*** গুণের প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করে, আর জগত দেখে নেয় যে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক তিনিই যিনি সর্বশ্রোতা, তিনি আমাদের দোয়াসমূহ শুনেন সেই সাথে এটা জানিয়েও দেন আমি তোমাদের দোয়া শুনেছি। এভাবে পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সর্বশ্রোতা খোদা তা'লার গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভে জগত সক্ষম হবে।

উনিশতম উদ্দেশ্য এটা যে, দুনিয়া এর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে, এটি হবে না যে বান্দা নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যে দোয়া করে হুবহু সেভাবেই তিনি তা গ্রহণ করে নেন বরং বান্দা দোয়া করবে এমন ভাবে যে বিনীত দোয়াকে উচ্চমার্গে পৌঁছে দিলে তার ***'রব্ব'***- তার প্রভু-প্রতিপালক তার দোয়া শুনবেন আর কবুল করবেন, তবে তিনি (আল্লাহ্) তা কবুল করবেন অদৃশ্য ভবিষ্যতের সম্যক জ্ঞাতা হিসেবে অর্থাৎ যে রঙে বান্দার ঐ কৃত দোয়াসমূহ কবুল হওয়া উচিত সেইরূপে। কতিপয় দোয়া বাতিল হয়ে যাওয়া অথবা কতিপয় দোয়া ঐরূপে পূর্ণ না হওয়া যে রূপে দোয়া করা হয়েছিল, এটা সাব্যস্ত করে না যে খোদা ***'সামীউন'*** (সর্বশ্রোতা) নন বা ***'কাদীর'*** (সর্বশক্তিমান) নন বরং এটাই সাব্যস্ত করে যে খোদা তা'লাই নিজ সত্ত্বায় ***'আল্লামুল গুয়্যুব'*** (অদৃশ্য ভবিষ্যতের

পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী খোদার নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান জগত লাভ করতে সক্ষম হবে।

সম্যক জ্ঞাতা)। অতএব পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্তি এইজন্য রাখা হয়েছে যে খোদা তা'লার বান্দারা ***'আলীম'*** খোদার সাথে পরিচিত হোক আর তাঁকে চিনতে থাকুক, তাঁকে জানতে থাকুক, তাঁকে সনাক্ত করতে পারুক।

বিশতম উদ্দেশ্য–এখানে এটা বর্ণিত হয়েছে যে ***'ওয়া মিন যুররিইয়্যাতিনা উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল্‌লাকা'*** অর্থাৎ ***উম্মতে মুসলিমাকে*** আমার বংশধরের মধ্যে থেকে জন্ম দিও। আল্লাহ্ তা'লা এখানে আলোকপাত করেছেন – আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, যে যুগে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জগতের বুকে আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর (স.) জাতি ***'উম্মাতাম মুসলিমাতান'*** হওয়ার যোগ্যতা রাখে আর ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার ফলে সেই উম্মত ***'উম্মাতাম্ মুসলিমাতান'***-এ পরিণত হয়ে যাবে; আর এর অর্থ এটাও যে ওই নবী যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে সে মক্কায় জন্ম লাভ করবে, তবে তোমরা দোয়ায় রত থাক যে, 'হে খোদা! আমাদের ও আমাদের বংশধরদের দুর্বলতা আর অনীহার ফলে এমনটি যেন না হয়ে যায় যে তোমার দৃষ্টিতে আমরা তাঁর যোগ্য না থাকি, আমাদের সাথে দেওয়া ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হয় বরং অন্য কোন জাতিতে ঐ নবী আবির্ভূত হয়ে যায়'। তাই বলেন তুমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে ***'উম্মতে মুসলেমা'*** বানিও। প্রথম সম্বোধনেও রয়েছেন তিনি আর গোটা বিষয় কবুলকারীও তিনি নিজেই।

অতএব, এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই উম্মত যারা হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে জন্ম লাভ করেছে তারাই হল ***'উম্মতে মুসলেমা'***। ঐ নবীকে অস্বীকার করো না। ঐ নবীর প্রতি ঈমান এনো– যে সব দায়িত্ব তাঁর (সা.) কাঁধে ন্যস্ত হয় তা পালনের শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা তিনি রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে আমরা তাদেরকে এমনই জাতিরূপে গড়তে চাই আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুনর্নির্মাণ করিয়েছি।

একুশতম উদ্দেশ্য এটা বর্ণিত হয়েছে যে, ***'আরিনা মানাসিকানা'***। এতে এ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে সম্মানিত স্থান মক্কা থেকে এমন এক রসূল (স.) জন্ম লাভ করবেন যিনি জগতের বুকে ঐ যুগে আগমন করবেন যখন তিনি নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক পরিপোষণের পর এমন এক মর্যাদায় পৌঁছে যাবেন যে তিনি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়তের ধারকে পরিণত হবেন। এমন শরীয়ত যা পূর্ববর্তী ধর্ম বিধানগুলোর তুলনায় অত্যুজ্জ্বল, এমন শরীয়ত যার মাঝে সময়োপযোগী আমল করার শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং এমন শরীয়ত যা প্রত্যেক জাতির সর্বকালের প্রয়োজনসমূহ ও চাহিদাগুলোকে পূর্ণতা দানকারী। ***'আরিনা মানাসিকানা'***– আমাদের যুগোপযোগী যেসব কাজকর্ম যেসব ইবাদত বন্দেগী আর যেসব দায় দায়িত্ব রয়েছে সেসব আমাদের দেখিয়ে দাও আর শিখিয়ে দাও। অর্থাৎ কুরআনের শরীয়ত বিধি-বিধান আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কর।

এভাবে ***'আরিনা মানাসিকানা'***য় এটা ব্যক্ত হয়েছে যে ঐ রসূল যখন আসবেন বিশ্বের সকল জাতিসমূহের সাথে তার যোগাযোগ হবে আর তেমনিভাবে সর্বযুগের সাথেও যোগসূত্র হবে । অতএব দোয়ায় রত থাক যে- হে আমাদের 'রব্ব' বিভিন্ন জাতির চাহিদা ও আচার-আচরণে পার্থক্য রয়েছে, বিভিন্ন যুগের চাহিদাতেও তারতম্য রয়েছে, এসব দৃষ্টিপটে রেখে এমন পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ শরীয়ত অবতীর্ণ কর যা সকল জাতির প্রকৃতিগত চাহিদাকে পূরণকারী হয় আর সর্বযুগের সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানকারী হয় এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে, যাতে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্ যে উদ্দেশ্যে রেখেছেন তা পূর্ণতা লাভ করে।

বাইশতম উদ্দেশ্য–আল্লাহ্ তা'লা এটা ব্যক্ত করেছেন যে ***'ওয়াতুব্ আলাইনা'*** এতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, শেষ শরীয়ত যা এখানে অবতীর্ণ করা হবে তার খুবই গভীর সম্পর্ক হবে ***'রাব্বে তাওয়াব'***-এর সাথে আর ঐ শরীয়তের অনুসরণকারীরা সেই গভীর মর্ম শনাক্তকারী হবে যে অনুশোচনা (তাওবা) ও ক্ষমা (মাগফিরাত) ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান (মারেফাত) অর্জন সম্ভব নয়, এ জন্য সে বার বার তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথে কুরবানীদাতা হতেই থাকবে আর বারে বারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হতে থাকবে সেই সাথে বলবে যে, হে খোদা! আমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর। ঐ জাতি এমনই হবে যে, যারা পূণ্যকর্ম করার পরও ঐ বিষয়ে ভয় পেতে থাকবে যে, পূণ্যকর্মের কোনটা আমাদের বাদ পড়ে যায়নি তো! যার কারণে আমাদের 'রব্ব' অসন্তুষ্ট হয়ে যান। তারা সর্বক্ষণ ইস্তেগফারে (অনুতাপ) ও তওবায় (অনুশোচনা) নিমগ্ন জাতি হবে।

তেইশতম উদ্দেশ্য– আল্লাহ্ তা'লা এটা বলেছেন যে, ***'রাব্বানা ওয়াব্‌আস ফিহিম রাসুলাম্ মিনহুম'*** অর্থাৎ আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মভূমি ঐ স্থানকে নির্ধারণ করতে চাই, আমরা ঐ স্থানকে এমন মর্যাদা দিতে চাই যে, যার অভ্যন্তরে অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতির সাথে আর বিনম্র কোমলতার সাথে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার সাথে কৃত দোয়ার ফলশ্রুতিতে আমরা স্বীয় এক দাস সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মুহাম্মদীয়ত (প্রশংসিত)-এর মর্যাদাবান অবস্থানে দন্ডায়মান করবো, আর তার মাধ্যমে এমন এক শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে আর এমন এক উম্মতের উদ্ভব ঘটানো হবে যারা নিজেদের মাঝে জীবন্ত নিদর্শন ধারণ করবে ***'ইয়াতলূ আলাইহিম আয়্যাতিকা'*** আর যিন্দা খোদার সাথে ও জীবন্ত রসূলের সাথে আর জীবিত শরীয়তের সাথে তাদের সম্পর্ক হবে।

তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের শিক্ষা দান করা হবে তবে অবুঝ শিশুদের যেভাবে বলা হয় তাদেরকে সেভাবে বলা হবে না যে, আমরা বলছি আর তোমরা মেনে নাও। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও মেধাকে সতেজ করতে স্বীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশাবলীও ঐ নবীর মাধ্যমে তাদেরকে জানাবেন আর এভাবে তাদেরকে এতটা পবিত্র করে দেয়া হবে যে সে ধরণের পবিত্রতালাভ পূর্ববর্তী কোন জাতির

হে আমাদের 'রব্ব' বিভিন্ন জাতির চাহিদা ও আচার-আচরণে পার্থক্য রয়েছে, বিভিন্ন যুগের চাহিদাতেও তারতম্য রয়েছে, এসব দৃষ্টিপটে রেখে এমন পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ শরীয়ত অবতীর্ণ কর যা সকল জাতির প্রকৃতিগত চাহিদাকে পূরণকারী হয় আর সর্বযুগের সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানকারী হয় এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে, যাতে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্ যে উদ্দেশ্যে রেখেছেন তা পূর্ণতা লাভ করে।

ক্ষেত্রেই ঘটে নি আর এটা এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিও সাগ্রহে মেনে নেয়। কেননা পূববর্তী প্রায় সব উম্মতের প্রতি অসম্পূর্ণ শরীয়তের অবতরণ হয় আর সেই অপূর্ণ পথ নির্দেশনার কারণে তাদের আত্মশুদ্ধি যদি হয়েও থাকে তাহলে ঐ আত্মশুদ্ধিও পূর্ণাঙ্গীন নয়। তা ছিল তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী, শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী; কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গীন আত্মশুদ্ধিমূলক ছিল না।

যেহেতু যে শিক্ষা তাদের দেয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গীন নয় কেননা তাদের চেতনাবোধ ও সামর্থ্যও পূর্ণাঙ্গীন নয় সেই জন্য সেই জাতির উদ্ভব যখন হল যারা পূর্ণাঙ্গীন শরীয়তের ধারক হওয়ার সামর্থ্য রাখতো তখন তাদের মধ্যে থেকে যেসব লোকেরা অসাধারণ কুরবানীসমূহ পেশ করে খোদা তা'লার ভয় রেখে তাঁর যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন করে ও সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা করে তাঁর সমীপে কাকুতি মিনতির সাথে নিজ জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যে, তার আত্মশুদ্ধি লাভ হয় (অবশ্য খোদা তা'লার অনুগ্রহের কারণেই এরূপ হয় নতুবা এটা তার আমলের ফল নয়) সেটি হবে একটি পূর্ণাঙ্গীন আত্মশুদ্ধি, তদ্রূপ এক পাকপবিত্রতাও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাতে এতটাই সম্মত ও সন্তুষ্ট হোন যে ঐরূপ সন্তুষ্টি পূববর্তী জাতিসমূহ অর্জন করতে পারে নি।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলছেন যে বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই যে- এক ***খায়রুর রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে*** পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত করা আর পরবর্তিতে মানবজাতিকে মর্যাদার উচ্চস্তরে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠিত করা, যে উন্নতির শিখরে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমাদের বিনীত দোয়া যে তিনি আমাদেরকে সর্বদা নিজ অনুগ্রহে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আমরা তো অত্যন্ত দূর্বল ও অযোগ্য আর অনিষ্টকারী ও পাপী এবং অবুঝ আর স্থুল বাসনা কামনায় পরিবেষ্টিত হয়ে আছি, তবে তিনি যদি চান আর তাঁর অনুগ্রহ ও আশিস আমাদের প্রতি বর্ষিত হলে সব রকমের নোংড়ামি ও মন্দ থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করে পবিত্রতার ঐ উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি উম্মতে মুসলিমাকে দিয়েছেন।

পরবর্তী খুতবাগুলোতে ইনশাআল্লাহ্ আমি ঐ তেইশ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তার বিশদ বর্ণনা দিব। আমি ধীরে ধীরে আপনাদেরকে সেই বিষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছি যে সম্পর্কে আমি পূর্বেও ইঙ্গিত দিয়েছি যে এক মহান উদ্দেশ্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন আর সবাইকে একত্রিত করে সংশোধন করতে, সেই কর্মসূচী বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

যাহোক আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে জ্ঞানগত ও মেধাগত দিক থেকে প্রস্তুত করতে। তবে আমি কে (?) আর আমার বলায় কীই-বা এলো গেল (?) যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার কথাতে প্রভাব সৃষ্টি না করছেন আর আপনাদের অন্তরকে সেই কথার প্রভাব গ্রহণ করার সামর্থ্য দান না করছেন। এ জন্য আপনারা দোয়ায় রত থাকুন, আমিও দোয়া করছি যে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও আশিসে আমাদের জামাআত দ্বারা সেই কর্ম সাধন করান, যে মহান কর্ম সাধিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা সেই পবিত্র গৃহ (কাবা) নির্মাণ করেছেন। (আমীন!)

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) কর্তৃক ৭ এপ্রিল ১৯৬৭ মসজিদ মুবারক রাবওয়ায় প্রদত্ত জুমুআর খুতবা। 'বায়তুল্লাহ্ কি ইয্সরে নও তামিরকি তেইশ আযিমুশ্বান মাকাস্যেদ' পুস্তক থেকে ভাষান্তরিত]

ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

ঈদুল আযহার খুতবা

“মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করুন আল্লাহ্ তা’লা যেন তাদেরকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি দেন এবং বিবেক-বুদ্ধি দান করেন আর এভাবে সকল মানবকুলের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা’লা মানব জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করুন।”

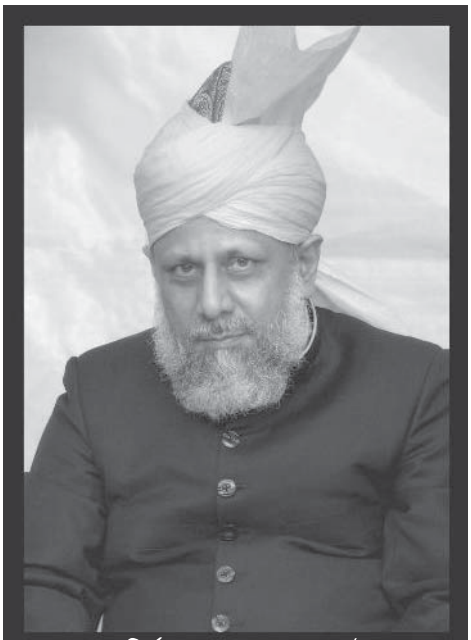

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৭ অক্টোবর, ২০১২-এর ঈদুল আযহার খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

হুযূর (আই.) বলেন: আজও আমি গতকালের খুতবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করবো বা তার অংশ বিশেষের ধারাবাহিকতায় খুতবা দিব।

মুসলমানদের সেই অবস্থা যেমনটা আমি উল্লেখ করেছিলাম, সেই যুগে এমন ছিল, প্রত্যেকেই চিৎকার করে আহাজারি করছিল বা এই ঘোষণা করছিল এবং তাদের অবস্থা এমনই ছিল যে, কেউ যেন তাদেরকে উদ্ধার করতে আসে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা উচু করে, এমন কারো আগমন যেন ঘটে, যে তাদের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সঞ্চার করে এবং তাদের হৃদয়ে মানবতাবোধ জাগ্রত করে, আর তাদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব দ্বিতীয়বার পুণ:প্রতিষ্ঠা করে। কেউ যেন আসে আর তাদেরকে একই উম্মতভূক্ত করে দেয়। এমন কারো আগমন যেন হয়, যিনি একত্ববাদকে পৃথিবীতে প্রকৃতই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

গতকাল আমি হালীর কবিতাগুচ্ছ থেকে একটি পংক্তি পাঠ করেছিলাম। আজ তা থেকে প্রথম দু’টি পংক্তি শুনিয়ে দিচ্ছি, যাতে তিনি তৎকালিন মুসলমানদের অবস্থার এক চাল-চিত্র তুলে ধরেছেন।

না ছ্যরদত রাহি উনকি কায়েম না ইজ্জত গিয়ে ছোড় সাথ উনকা আকবাল দওলত
হুয়ে এলম দাফন উনসে এক এক রুখসত
মিট্টি খুবিয়া সারি নওবত বানওবত

অর্থাৎ
না আভিজাত্য অবশিষ্ট ছিল আর না ছিল

সম্মান
সেই সাথে হারিয়ে গিয়েছে সকল ধন-সম্পদ
জ্ঞান-বিজ্ঞানও নিল তাদের থেকে বিদায়
যা কিছু ছিল তাদের প্রশংসনীয় সবটাই হলো মাটি।

অতএব, এই ছিল তাদের অবস্থা। এই পংক্তি যদি আপনারা পাঠ করতে থাকেন তাহলে দেখবেন এর প্রতিটি পংক্তি এবং সকল কবিতা শুধু তৎকালীন যুগেরই চিত্র তুলে ধরে না বরং বর্তমান যুগের অবস্থার চিত্রও অঙ্কন করে রেখেছে। আজও প্রত্যেক মুসলমান, হোক সে মুসলিম নেতা বা সাধারণ মুসলমান। প্রত্যেকেই এই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত যে, কিভাবে সে অধিক থেকে অধিকতর লাভবান হবে। পূর্বে কেবল মাত্র তো নেতারা, রাজনীতিবিদরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতো, কিভাবে প্রভাব অর্জন করা যায়, আর ক্ষমতা দখল করে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির বাসনাও তাদের ছিল। বর্তমানে ক্ষমতার মোহে ধর্মের নামে ধর্মীয় পণ্ডিত আলেমরাও পৃথক দল বানিয়ে নিয়েছে। প্রথমে ফির্কাগত পার্থক্যের কারণে এরা একে অপরের শিরোচ্ছেদ করতো আর এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দলের নাম, তথাকথিত জেহাদের নামে কলেমা পাঠ কারীদেরকে হত্যা করছে আর নিজেদের ভ্রান্তিপূর্ণ যে রীতি-নীতি আছে তা সংশোধনের জন্য কোন চেষ্টাও করছে না।

সংশোধনের অযোগ্য তাদের এই যে অবস্থা, তা হালী তার পংক্তিতে একশ' বিশ বা পঁচিশ বছর পূর্বে অঙ্কন করেছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, বাস্তবে আজো তা-ই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। বরং গভীরভাবে ভাবলে ও দৃষ্টিপাত করলে এর চেয়েও অধিক ভয়ানক এক চিত্র ফুটে উঠে। একটি শ্রেণীকে লোভ লালসা এবং শাসন ক্ষমতা আরও বেশি অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আর অনেক বেশি অন্ধও হয়ে গেছে এই লোকেরা। হালী তার পংক্তিতে যথার্থই লিখেছেন-

নেহি তাজেগিকা কহি নাম জিস পার
হ্যরি ঢনিয়া ঝড় গেয়ি জিসকি জ্বলকর

সজীবতার লেশ মাত্র নেই যাতে; শুষ্ক শাখা-প্রশাখা তা থেকে তো ঝরেই যাবে।

অতএব, অনুতাপকারী প্রত্যেক মুসলমানের সকাতর এই ধ্বনি আজো উঠছে। আর এতে হতাশাও এভাবে প্রকাশ করা হয় যে, হয়তোবা আমরা এখন আর সংশোধনের যোগ্য নই। কিন্তু এটি এই কারণে যে, আল্লাহ্ তা'লার আহ্বানে কর্ণপাত করা হচ্ছে না আর জেনে বুঝেও আলেমরা আর নেতৃবর্গরা জনসাধারণের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর যারা আহাজারি করতো তারাই আজ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আহ্বান শুনে আগমণকারীকে গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষরা তো সেই লোকদেরই কথা মেনে চলে যারা মিথ্যা কথা বলে, অথচ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে আহ্বানকারী এসেছেন তাঁর আহ্বানের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। শুধু এতটুকুই নয় যে কর্ণপাত করছে না, বরং তার বিরোধিতায়ও সব সীমা লঙ্ঘন করছে। আহমদীদের ক্ষতি করার জন্য সব ধরণের বৈধ অবৈধ কাজের জন্য তারা প্রস্তুত আছে এবং তা করেও চলছে। ব্যবসায়ী লোক হয়ে থাকলে আহমদীদের মূলধন আটকিয়ে দেয় আর লভ্যাংশ দিতেও অস্বীকার করে বসে। এমনকী অবশিষ্ট মুলধন ফেরত দিতেও গড়িমসি করে। এ সম্পর্কিত বিধান তারা জানে, আর ভালো রূপে জানা থাকা সত্ত্বেও হারাম ভক্ষণ করছে আর পরে বলে থাকে যে, আহমদীদের সম্পদ লুট-পাট করা, তাদের থেকে হারাম খাওয়াও পুন্যের কাজ। এই শিক্ষাই তাদের আলেমদের, যা তারা লোকদেরকে দিয়ে থাকে।

হালী এমন ভুল শিক্ষা প্রদানকারী উলামা এবং অত্যাচারী নেত্রীবর্গ সম্পর্কেই হয়তো একথা বলেছেন যে, এটা এমনই, যা ভস্মীভূত হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ সেই বৃক্ষ, যা ছিল ছায়া প্রদানকারী, জ্বালানোর যোগ্য হয়ে গেছে সেই সব। সেই সকল উলামা যারা ধর্মের শিক্ষা দান করে আর সেই সকল নেতা যারা জাতির বেদনা অনুধাবনকারী ছিল, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে তারা এমন হয়ে গেছে যে, এর যোগ্যতাই

"আল্লাহ্ তা'লার লাগানো বৃক্ষকে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা মহানবী (সা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী এই একনিষ্ঠ প্রেমিকের মাধ্যমে খোদা তা'লার তৌহীদ এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার এবং তার প্রতিষ্ঠা হওয়া নির্ধারিত ছিল।"

হারিয়ে বসেছে, তাদের কাছ থেকে কেউ এখন আর ভাল কিছু পাওয়ার আস্থা রাখতে পারছে না।

এখন তারা এমন বৃক্ষে পরিণত হয়েছে যে, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার ছাড়া তা আর কোন কাজের যোগ্য নেই। এছাড়া আর কোন কাজে তা আসতেই পারে না। কেননা, এই লোকেরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণ। এই বৃক্ষ যা রয়েছে তা সত্যিই জ্বালানিযোগ্য হওয়ারই কথা ছিল আর হয়েছেও তা-ই। কেননা এখন কেবলমাত্র সেই বৃক্ষই পৃথিবীতে কল্যাণ পৌঁছানোকারী সাব্যস্ত হতে পারে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে লাগিয়েছেন আর সেই সময়ে এই বৃক্ষ রোপিত হওয়ার কথা, যখন মহানবী (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের এবং তাদের আলেমদের এই অবস্থা হওয়ার কথা, যা আজ হয়েছে। যেজন্য তারা রোদনও করছে।

"বাহ্যিকভাবে হজ্জ পালন করা হচ্ছে কিন্তু হৃদয় হয়তো অন্য কোন 'কাবা'র তোয়াফ করছে। এদের মধ্য থেকে অধিকাংশের একই অবস্থা"

হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, (এর অর্থ আমি শুনিয়ে দিচ্ছি) অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সেই যুগের লোকদের মসজিদগুলো যদিও বাহ্যিকভাবে আবাদ মনে হবে কিন্তু তা হেদায়াত শূন্য হবে। তাদের আলেমরা আকাশের নিচে বসবাসকারী জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদের মধ্য থেকেই ফিতনা-ফ্যাসাদের উদ্ভব হবে আর তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে। (বায়হাকী, মিশকাত) অর্থাৎ এরা সকল প্রকার মন্দ স্বভাবের অধিকারী হবে আর মন্দের উৎসস্থলও হবে এরাই ।

আবার আরেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে- আমার উম্মতের ওপর অস্থিরতা এবং ভীতির এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা তাদের আলেমদের কাছে সঠিক নির্দেশনা পাওয়ার বাসনায় যাবে কিন্তু সে তাকে বানর এবং শুকরের ন্যায় দেখতে পাবে (কানযুল উম্মাল)। অর্থাৎ অচিরেই আলেমদের নিজ ধর্মীয় অবস্থা এবং চরিত্রও খারাপ হয়ে যাবে, ন্যাক্কারজনক অবস্থা হবে তাদের।

অন্যত্র হযরত ছাই'লবাহ বাহরাইনী বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবী থেকে জ্ঞান তুলে নেয়া হবে। এমনকি জ্ঞান ও হেদায়েত আর বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন শিক্ষা তাদের মাঝে অবশিষ্ট থাকবে না। সাহাবাগণ (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জ্ঞান কিভাবে নি:শেষ হয়ে যাবে যখন আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে আর এটি আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিতে থাকব। এর জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, তাওরাত এবং ইঞ্জিল কি ইহুদী আর খ্রিষ্টানদের মাঝে বিদ্যমান নেই? কিন্তু তাতে কি তাদের কোন কল্যাণ হয়েছে? অর্থাৎ আমল থাকবে না। আবার ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর ব্যাখ্যাসমূহ যখন আসতে থাকবে তখন কুরআনের প্রকৃত শিক্ষাকেই লোকেরা একেবারে ভুলে বসবে।

এরপর আরেক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'লা লোকদের কাছ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান ক্ষণিকেই তুলে নিবেন না বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে তা নি:শেষ হবে। যখন কোন আলেম থাকবে না তখন লোকেরা চরম অজ্ঞ লোকদেরকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিবে আর তাদের কাছে গিয়ে নিয়ম-কানুন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে আর তারা অজ্ঞতা প্রসূত ফতওয়া দিয়ে দিবে। অতএব, সে নিজেও পথভ্রষ্ট হবে আর অন্য লোকদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

আজকাল, আপনারা এমন টিভি চ্যানেল দেখে থাকবেন যেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত হাসি-তামাশার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। 'ইস্তেখারা' নামে একটি চ্যানেল রয়েছে। তারা সেখানেই বসে পুস্তক খুলে আর বলে দেয় যে, আচ্ছা, এইসব করা হয়েছে, এরপর দু'চারটি প্রশ্নও করা হয়, জানি না কি ইস্তেখারাই বা করল, কিন্তু তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়ে দেয়া হয় যে, তোমার সাথে এমনটা-ওমনটা ঘটবে। অর্থ উপার্জনের অদ্ভুত কৌশল তৈরী করে নিয়েছে তারা।

অত:পর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একটি মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তাঁর কাছে মরুবাসী এক ব্যক্তি আসলো আর জিজ্ঞাসা করলো, কেয়ামতের আগমন কখন হবে? মহানবী (সা.) তার কথার দিকে মনোযোগ না দিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে রইলেন। এতে কিছু লোকের অন্তরে এই ধারণা হলো যে, মহানবী (সা.) হয়তো এই গ্রাম্য লোকের কথা শুনেছেন কিন্তু পছন্দ করেননি। আর কিছু লোক এমন ধারণা করেছে যে, তিনি (সা.) হয়তো তার কথা শুনেন নি। কিন্তু মহানবী (সা.) কথা বলা যখন শেষ করলেন, তখন সেই গ্রাম্য ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং বললেন, কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? গ্রাম্য ব্যক্তিটি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উপস্থিত আছি। এরপর তিনি (সা.) বললেন, উত্তর শুনে নাও। অধ:পতনের ফলে উম্মতের মধ্যে আমানতদারী যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কিভাবে শেষ হয়ে যাবে? তিনি (সা.) বললেন, যখন অযোগ্য এবং অনুপযুক্ত লোকদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেয়া হবে। অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতা, বেঈমান এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এসে যাবে আর নিজেদের বেঈমানী এবং অযোগ্যতার কারণে তারা জাতিকে ধ্বংস করে দিবে। আর এমনটাই আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আজ কোন একটি মুসলিম দেশও এই অবস্থার ব্যতিক্রম নয়।

অতএব, এই সব কিছুই যখন বর্তমানকালের আলেম এবং নেতাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বর্ণনা করেছেন আর এটা সত্য প্রমাণিত হয়েই চলেছে, তাহলে কিভাবে এটা হতে পারে যে, সেই লোকদের থেকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যাবে? তাদের থেকে কিভাবে কুরআনের ব্যাখ্যা আশা করা যায়? তাদের কাছে কিভাবে আশা করা যায় তারা তৌহীদের পথে পরিচালনাকারী হবে? কিন্তু মুসলমান, অন্যান্য নবীর উম্মতের ন্যায় নয়, যাদের সঠিক পথ লাভের কোন ভরসা নেই। যাদের জন্য আজ কেবলমাত্র নৈরাশ্য আর হতাশা বিরাজ করছে।

যাদের ধর্মের মধ্যে ব্যাধি সৃষ্টি হলে তা শুধরানোর জন্য কেউ নেই, সঠিক এবং মৌলিক শিক্ষাকে ভুলে বসাই কি তবে তাদের জন্য অবধারিত? না, মুসলমানতো সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের মধ্যে এইসব অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও যার চিত্র মহানবী (সা.) অঙ্কন করেছেন আর যা আমি হাদীসের আলোকে বর্ণনা করেছি। তিনি (সা.) এই আশ্বাসও দিয়েছেন বরং নিশ্চয়তা দিয়েছেন, খোদা তা'লা উম্মতের এবং সকল মানবজাতির সংশোধনের জন্য আখারীনদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি ঈমানকে সপ্তর্ষী মন্ডল থেকে পুণরায় পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন। ইসলামের হারানো সৌন্দর্যকে দ্বিতীয়বার দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারপর সকল মুসলমানকে এবং পুণ্য স্বভাবের লোকদেরকে এক হাতে একত্রিত করে মহানবী (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত করবেন। আর তাদেরকে একই উম্মতভূক্ত করবেন। তারা মহানবী (সা.)-এর খাঁটী প্রেমিক হবেন।

অতএব, মহানবী (সা.)-এর এই বাণীর প্রতি মনোনিবেশ করা উচিৎ। এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এই জন্য জরুরী যে, ঈমানকে সপ্তর্ষী মন্ডল থেকে ফিরিয়ে আনা ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে।

এটা যখন প্রমাণিত এক বাস্তবতা, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধর্মের ঠিকাদারদের এবং তথাকথিত আলেমদের পরিণতি দৃশ্যমান, সেক্ষেত্রে এর চিকিৎসা পদ্ধতিও তো তিনিই (সা.) বাতলে দিয়েছেন, এর প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী, নইলে মাথা ঠুকে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁর আগমণ ছাড়া আর কারো আগমণ ঘটবে না যিনি ইসলামের দ্বিতীয় কুদরতকে পুণরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন, বা বলতে পারেন যার সাথে ইসলামের পুন: জাগরণ সম্পৃক্ত।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আনুমানিক অর্ধেক পৃথিবীতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি সংগঠনও রয়েছে কিন্তু ইসলামী বিশ্বে এই ব্যবস্থাপনার প্রভাব কতটুকু রয়েছে? কোন ধরণের প্রভাব কি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে? এটা হওয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল যে, অ-মুসলিম বিশ্বের উপর এই সংগঠনের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু হচ্ছেটা কি? নিজেদেরই দেশে অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেই তাদের কথা মান্যকারী কেউ নেই। মুসলিম দেশগুলোতো নিজেদের কর্মপদ্ধতির জন্য একটি সংগঠন বানিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে আর নিজেদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য, কিন্তু এর সদস্য যারা প্রত্যেকেই চলছে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রাস্তায়।

তারপর দেখুন, জঙ্গি সংগঠন যতগুলো রয়েছে, এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে মুসলিম দেশগুলোতে। হত্যা ও আত্মঘাতি হামলার মত জঘন্য কার্যকলাপ যা আছে তা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইসলামী দেশগুলোতে। ব্যক্তিগত শক্তির দাপট প্রকাশ করার জন্য আর ইসলামী দেশগুলোতে নিজেদের ক্ষমতা বজায়ে রাখার জন্য সাধারণ জনগণের ওপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করা হচ্ছে । তাদের সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, তাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদের জীবনকে পশুর চেয়েও হেয় মনে করে হত্যা করা হচ্ছে আর লুণ্ঠন করা হচ্ছে তাদের ধন সম্পদ। কিছুতো এসব নিজেদের ক্ষমতার লোভে করছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি দুর্ভাগ্য হলো, এইসব অত্যাচার খোদা তা'লার নামেই করা হচ্ছে। ধর্মের নামে রক্ত ঝরানো হচ্ছে। রাসূলের নামে, হ্যাঁ, সেই রাসূলের (সা.) নামে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাঁরই নামে অত্যাচারের এই উপাখ্যান রচিত হচ্ছে।

আজকে বড় ঈদ বা কুরবানীর ঈদ। যার মধ্যে এই সময় মুসলমানদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানী করার পরিবর্তে তার ঘাড়ে ছুড়ি না চালিয়ে এক পশু কুরবানী করেন। সেই যুগের প্রচলিত রীতি যা ছিল, তাকে তিনি শেষ করে দিয়েছেন, অর্থাৎ পশু কুরবানীর মধ্য দিয়ে প্রতীকিভাবে যেন মানবাত্মাকে কুরবানী

করা হয়। এই শিক্ষা দেয়া হয় এখন থেকে মানুষের পরিবর্তে পশু জবেহ করা হবে। কিন্তু এই ইসলামী দেশগুলোতে মানুষের প্রাণ থেকে পশুর প্রাণকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়। নিঃস্পাপ প্রাণ, শিশু, নারীদের আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হয়। আর এমন হয় যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হদিসই পাওয়া যায় না আর চেনাও যায় না যে, শরীরের অঙ্গ কোনটি কোথাকার আর কোথায় গিয়েছে। ঘর থেকে একটি শিশু বের হলে পিতা-মাতার জানা থাকে না যে, রাতে সে ঘরে ফিরে আসবে, নাকি আসবে না। আর যদি কোনভাবে ফেরত এসেও যায়, তাহলে আশঙ্কা থাকে তার লাশ সনাক্ত করা যাবে কি না?

“সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আনুমানিক অর্ধেক পৃথিবীতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে মুসলিম দেশগুলোর জন্য একটি সংগঠনও রয়েছে কিন্তু ইসলামী বিশ্বে এই ব্যবস্থাপনার প্রভাব কতটুকু রয়েছে? কোন ধরণের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কি?”

ঈদের দিনেও এই অন্যায় কাজ করা হচ্ছে। গতকাল আফগানিস্তানে এমনইভাবে ঈদের দিনে হামলা করা হয় আর কয়েক ডজন মানুষকে হত্যা করা হয়। সিরিয়ার অবস্থাও আজকাল খারাপের দিকে যাচ্ছে। সিরিয়াতে না সরকার ন্যায়ের সাথে কাজ করছে, আর না সরকার বিরোধীরা। এটা বলা হচ্ছে যে, এসবের মধ্যে জঙ্গি সংগঠনগুলোও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ বিবেক-বুদ্ধির সাথে কাজ করছে না। বিবেকতো দূরের কথা, নিজেদের কর্মে আর নিষ্পাপদের প্রাণ হরণের ক্ষেত্রে এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করছে। আর এহেন অবস্থা, কোন একটি দেশের বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় বরং যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজ করছে।

পাকিস্তানে প্রত্যেক দিন কয়েক ডজন মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আফগানিস্তানেও ডজন ডজন প্রাণ যাচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য দেশ, যেমন– আফ্রিকার দেশসমূহেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। আরব দেশেও একই অবস্থা, আর এসব কিছু হচ্ছে শরীয়ত এবং ধর্মের নামে, এভাবে ইসলাম বিরোধীদেরকে ইসলাম-কে পরিহাস করার ও আপত্তি উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

গত দিনগুলোতে চৌদ্দ পনের বছরের এক মেয়ে মালালার ঘটনা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশ্বে ইসলাম বিরোধিদের আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। এই জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছে, গুলি করে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ, সে কিছু জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে সঠিক কথা লেখা-লেখি করত। একারণে আক্রমণকারীরা বলে, কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা কুরআনে এক ছেলের ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় যে, সে বড় হয়ে বিদ্রোহী হতো তাই নবী তাকে হত্যা করে ফেলেছেন। সূরা কাহাফের ঘটনার দিকে হয়তো তারা ইঙ্গিত করে থাকে। প্রকৃত জ্ঞানতো তাদের নেই আর যেই মসীহ মাওউদ প্রকৃত শিক্ষা দেয়ার ছিল তাকে তো তারা মান্য করার জন্য প্রস্তুতও নয়। এরাতো শুধু বাহ্যিক জিনিষ দর্শন করে আর তার পিছনেই ছুটে। সেই হত্যাতো ছিল নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষার হত্যা। নিজের সংশোধন করা ও আত্মসংশোধন করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

যাই হোক, এখন আমি সেই প্রেক্ষাপটের দিকে যাচ্ছি না। তবে এটা অবশ্যই বলছি, এটা তাদের বৈশিষ্ট যা কেবল অত্যাচারের চরম সীমায় উপনিত হয়েছে, আর এতে ইসলাম বিরোধীদের সুযোগ তৈরী করে দেয়া হচ্ছে। কেননা যারা ইসলাম বিরোধী তারা এসব থেকে সুযোগ গ্রহণ করে। আর এসবই দুষ্ট-বুদ্ধির পরিকল্পিত কাজ।

সেখানে, পাকিস্তানে অথবা বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেহ মালালা’র মত কতজনই না আক্রান্ত হচ্ছে। এমন মালালা কতইনা রয়েছে, যার বোন অথবা ভাই, পিতা অথবা মাকে হত্যা করা হচ্ছে আর না তাদের কাউকে চিকিৎসার জন্য বাহিরে পাঠানো হয়েছে, আর না তাদের সমর্থনে ততোটা আওয়াজ তোলা হয়েছে। অতএব, এটাও একটি পরিকল্পিত স্কিম হতে পারে কিন্তু এর ভিত মুসলমানরা নিজেরাই রচনা করেছে। তারপর শুধু দেশের ভিতরেই নয় বরং মুসলিম দেশগুলোর সম্মান ও মর্যাদা বাহিরেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা, একতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকার কারণে এদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, মুসলিম দেশগুলোর জন্যই নি:সন্দেহে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কিন্তু তা একেবারেই নিষ্ফল। প্রয়োজনের সময় তারা অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন তুরস্ক এবং সিরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করছে। উভয় দিক থেকেই বিভিন্ন সময় আক্রমণ করা হচ্ছে। সেখানে নিষ্পাপ নগরবাসী প্রাণ হারাচ্ছে কিন্তু সার্বিকভাবে যে কথাটি আমি এখন বলতে চাচ্ছি তা এখানকার এক বিশ্লেষক লিখেছেন, অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলোর কথায় অর্থাৎ আমেরিকার কথায় তুর্কিরা আক্রমণ চালাচ্ছে আর প্রত্যেক হামলার পূর্বে আমেরিকার কাছ থেকেই তারা দিক-নির্দেশনা নিয়ে থাকে। তো এই হচ্ছে ইসলামী দেশগুলোর হাল-হকিকত। আমেরিকার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তারা এমনটা করে, এই কথার সত্যতা কতটুকু রয়েছে, খোদা তা'লাই ভালো জানেন। কিন্তু সেই দেশগুলোর লেখকদের একথা বলার সাহস এ জন্যই হয়েছে যে, তারা জানে, ইসলামী দেশগুলোর নিজেদের কোন শক্তি নেই আর পশ্চিমা বিশ্বের মুখ-পানে এরা চেয়ে বসে থাকে।

এই সবকিছু এ জন্যই হচ্ছে, একত্ববাদের যে শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে মহানবী (সা.) এসেছিলেন, তা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু*** তাদের জিহবার মধ্যে নি:সন্দেহে আছে কিন্তু অন্ত:সারশূন্য। সেই মহান রাসূল (সা.), যিনি পবিত্র কাবাগৃহ থেকে মূর্তি অপসারন করেছিলেন, আজকে ক্ষমতার মোহ এবং লোভের সেই মূর্তিকেই হৃদয়ে স্থান দিয়ে রাখা হয়েছে। এমনই যদি হয়, তাহলে কিভাবে এই লোকেরা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? বাহ্যিকভাবে হজ্জ পালন করা হচ্ছে কিন্তু হৃদয় হয়তো অন্য কোন 'কাবা'র তোয়াফ করছে। এদের মধ্য থেকে অধিকাংশের একই অবস্থা। বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার কেবল একজন ব্যক্তির হজ্জ গ্রহণ করা হয়েছিল আর তিনি ছিলেন সে ব্যক্তি, যিনি হজ্জে যান নি। তো এই উদাহরণ পুরাতন নয়। বর্তমানে এমন উদাহরণ পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, যখন কিনা কেবল লোক দেখানো হজ্জে যাওয়া হয়। এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, কার হজ্জ গ্রহণ হচ্ছে আর কারটা নয়।

হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, যেই আহমদীদের হৃদয়ে হজ্জ করার জন্য ব্যাকুলতা রয়েছে আর হজ্জ করতে যেতে পারছে না, তাদের হজ্জ গ্রহণ হচ্ছে, না তাদেরটা যাদের অধিকাংশই জুলুম ও অন্যায় করে হজ্জে চলে যায়। তৌহীদের প্রকৃত মর্ম এবং উদ্দেশ্য এই লোকেরা ভুলে বসেছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। অতপর এক মহান নবীর আগমণের জন্য দোয়া করেছিলেন, যিনি পৃথিবীতে তৌহীদের বাণী পৌঁছাবেন। এক খোদার সামনে মাথা নতকারী সৃষ্টি করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মুসলমানের আসল অবস্থা এমন যে, দৃশ্যত: তৌহীদের ঘোষণা করে ঠিকই কিন্তু শত কোটি শিরকের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর এই শিরককে পুণরায় শেষ করার জন্য মহানবী (সা.) তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী মসীহ-মাহদীর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ঈমান প্রতিষ্ঠা করার কথা, হৃদয়ে লালিত মূর্তি এবং বাহ্যিক মূর্তিকে ভেঙ্গে যিনি সেই একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করবেন যা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মহানবী (সা.)-এর আগমণ হয়েছিল। আর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই সাধন করেছিলেন তিনি (সা.), আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্যও এটিই।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তৌহীদ প্রতিষ্ঠার এবং বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য এবং এখান থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিস্তার করার জন্য নিজের বংশধরদের মধ্য থেকে এক মহান নবী প্রেরণের জন্য দোয়া করেছিলেন যা আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করেছিল আর সেই মহান নবী প্রতিমার সামনে মাথা নতকারীদেরকে এক

"খোদা তা'লার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস রাখলে, তিনি সব ধরণের ক্ষতি পুষিয়ে দেন। আর সেই বিশ্বাসে আস্থাশীল হলে, আমাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তাদানকারী বৈশিষ্টের ধারক হয়ে নিজের অধিকারকেও যদি ছাড়তে হয়, তাহলেও তা ছাড়া উচিৎ। এমন চিন্তা-ভাবনা যখন সৃষ্টি হবে তখন দেখবেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের মাঝে ঈমানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে।"

খোদার সামনে মাথা নতকারীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। বংশ পরম্পরায় যারা শত্রু মনোভাবাপন্ন ছিল তাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তার দূতে পরিণত করেছিলেন।

এই মহান নবী নিজ মহান উদ্দেশ্যকে কিয়ামত পর্যন্ত বহমান রাখার জন্য এক একনিষ্ঠ প্রেমিকের সংবাদ দিয়েছেন। যাকে মহানবী (সা.) ভালবেসে ***'আমাদের মাহদী'*** বলে সম্বোধন করেছেন।

অতএব, সেই মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবকের আগমণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন ইসলামের হারানো সৌন্দর্যকে দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যেই ধর্মকে, তাঁর (আ.) যুগে, যারা ইসলামের জন্য হৃদয়ে ব্যথা রাখতো তারা একে বিরান গৃহের সাথে তুলনা করতো, তিনি (আ.) ইসলামকে নতুন আঙ্গিকে আবার মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, হে ইব্রাহীম! তোমার প্রতি সালাম, আমরা তোমাকে প্রিয়দের মধ্য থেকে পছন্দ করেছি। আল্লাহ্ তোমার সব কাজ পূর্ণ করে দিবেন আর তোমার সব ইচ্ছাকে পূর্ণ করবেন। তুমি আমার পক্ষ থেকে এমনই, আমার একত্ববাদ এবং আমার একমে বা দ্বিতীয়ম যেমন।

অতএব, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সেই একনিষ্ঠ সেবক সেই মর্যাদা লাভ করেছে, তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের কল্যাণে হযরত ইব্রাহীম (আ.) যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়ে তার এতটাই ব্যথা ছিল যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনি (আ.) এতটাই গ্রহণীয় হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইব্রাহীম বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর প্রতি শান্তির বাণী পাঠিয়েছেন।

অত:পর আরেক ইলহামের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ***'গারাস্‌তু লাকা বেয়াদি রাহমাতি ওয়াকাদারতি ওয়া ইন্নাকাল ইয়াওমা লাদাইয়ানা মাকিনান আমীন'***। আমি নিজের হাত দিয়ে নিজ অনুগ্রহ ও কৃপার বৃক্ষ তোমার জন্য রোপন করেছি। আর তুমি আজকে আমাদের দৃষ্টিতে পদমর্যাদার অধিকারী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অতএব, এটিও বলেছেন যে, ***'দোহাতা ইসমাইল'*** অর্থাৎ ইসমাইলের বৃক্ষ তুমি। অভিধানে 'দোহা'র এক অর্থ এটিও লেখা রয়েছে যে, 'দোহা' এমন বৃক্ষকে বলে যা আকারে বিরাট ও বিস্তৃতিতে বিশাল।

অতএব, এই বৃক্ষ যা আল্লাহ্ তা'লা লাগিয়েছেন এটি ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এই জন্য যে, পৃথিবী যেন জানতে পারে, যেই বৃক্ষ হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) দোয়ার মাধ্যমে লাগিয়েছিলেন, যা সমগ্র পৃথিবীকে নিজ ছায়ার নিচে নিয়ে এসে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করার কথা ছিল এবং করেছেও তাই।

অর্থাৎ সেই মহান রাসূল (সা.) প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর শিক্ষা শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর বৃক্ষসদৃশ আলেমরা, যেভাবে হালী বলেছিলেন যে, এটি জ্বালানোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে বরং এই বৃক্ষ সেই একনিষ্ঠ প্রেমিকের মাধ্যমে পুণরায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠেছে। হ্যাঁ, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই বৃক্ষের মূল থেকে এমনই এক বৃক্ষের জন্ম হয়েছে যা মূল গাছের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তার ছায়া প্রদানকারী গাছ যা একত্ববাদের ফলের সাথে পৃথিবীকে পরিচিতি প্রদানকারী। এখন মৌলবীরা যত চিৎকার করুক আর যত পারে আহমদকে মুহাম্মদ (সা.) থেকে পৃথক করার জন্য চেষ্টা করুক।

এই বৃক্ষ ছাড়া আর কোন স্থান থেকে সেই কল্যাণ পৌঁছানো সম্ভব নয় যা মহানবী (সা.)-এর উভয় বৈশিষ্ট অর্থাৎ 'মুহাম্মদ' এবং 'আহমদ' এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। বিরোধীরা বিগত একশত পঁচিশ বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের লাভ হয়েছে কী? শুধু হৈচৈ করে নিজেদেরই বদনাম কুড়িয়েছে তারা! মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক এর মাধ্যমে যেই বৃক্ষ খোদা তা'লা নিজ হাতে লাগিয়েছেন, তার শাখা-প্রশাখা পৃথিবীর কোনায় কোনায় যখন বিস্তৃতি লাভ করছে, এর গায়ের ওপর বিরোধিতার ঝড় যা আসে তা সেই বৃক্ষের ডালপালা গুলোকে কিছু হেলিয়ে দিলেও গাছের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

অতএব, এখনো কি এই আলেমরা এবং তাদের অনুসারীরা চোখ মেলে দেখবে না? হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ময়দানে আমাকে সফলতা দান করেছেন আর শত্রুরা অপদস্থ হয়েছে, আমার বিরুদ্ধে কাফেরের ফতোয়া লাগানো হয়েছে, হত্যার মামলা করা হয়েছে, কয়েকবার আমার ধ্বংসের জন্য এমন কোন চেষ্টা নেই যা তারা করে নাই, কিন্তু খোদার সাথে কি কেউ যুদ্ধ করতে পারে? আমাদের উন্নতির কারণ এই বিরোধীরাই, অনেকে তাদের পত্র-পত্রিকা থেকে অবগত হয়, অনেক লোক তাদের ভুল বুঝতে পেরে বয়আত করেছেন। (আর এটি আজও একইভাবে ঘটে চলেছে। অনেক আরববাসী যারা আহমদী হচ্ছে তারা পত্র লিখছে যে, আমরা বিরোধী ওয়েবসাইট এবং টিভি চ্যানেল দেখে আর মৌলবীদের সাথে আলোচনা করে আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে আর আমরা আহমদীয়াত সম্পর্কে খোঁজ খবর নেই। তারপর একে সত্য পেয়ে তারা গ্রহণ করেছে।)

অত:পর তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে যদি বাগ্মীতাপূর্ণ কিছু করা হতো তাহলে আমাকে তার জন্য গর্বিত হতে হতো আর এটাও এক ধরণের অংশীবাদীতা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এথেকে রক্ষা করেছেন। একজন কৃষক নিজে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চনের কাজ করেন আর খোদাও তাঁর নিজের কাজ নিজেই করেন।

আমি এবং আমাদের জামা'ত খোদা তা'লার সাহায্যপুষ্টের মাধ্যমে উদগত। খোদা তা'লার লাগানো চারা গাছকে কার সাধ্য আছে একে উপড়িয়ে ফেলে? অত:পর আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, আমার উপর খুব কম রাতই এমন অতিবাহিত হয় যাতে আমাকে এই সান্তনা দেয়া হয় না যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং আমার আসমানী সৈনিকরা তোমার সাথে আছে। যদি কারো হৃদয়ে পবিত্রতা থাকে তাহলে সে মৃত্যুর পর খোদাকে দেখতে পাবে। কিন্তু সেই খোদার পবিত্র চেহারার কসম, আমি এখনও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবী

আমাকে চিনতে পারছে না কিন্তু তিনি আমাকে জানেন, যিনি আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এটি সেই লোকদের ভুল ধারণা এবং তাদের দুর্ভাগ্য যে, এরা আমার ধ্বংস কামনা করে। আমি সেই বৃক্ষ, যার প্রকৃত মালিক নিজ হাতে এটিকে লাগিয়েছেন। যে ব্যক্তি আমাকে কর্তন করতে চায় সে কারুন, ইয়াহুদ, উসকার, ইউতি এবং আবুজাহলের পরিণতি থেকে কিছু অংশ নিতে চায় বৈকি। আমি প্রতিনিয়ত এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, আমার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যে কোন ময়দানে বের হউক আর মিনহাজে নবুওয়াতের মানদন্ডে আমাকে যাচাই করুক আর এর পর দেখুক, খোদা কার সাথে আছেন।

অতএব, এর মাঝে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লার লাগানো বৃক্ষকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। কেননা মহানবী (সা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী এই একনিষ্ঠ প্রেমিকের মাধ্যমে খোদা তা'লার তৌহীদ এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার এবং তার প্রতিষ্ঠা হওয়া নির্ধারিত ছিল। তবে প্রত্যেক কুরবানীর ঈদ আমাদেরকে এই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় যে, সেই বৃক্ষকে পানি সিঞ্চনে সর্বদা সতেজ ও সজীব রাখতে আমরা যেন আমাদের প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মানকে শুধু প্রস্তুতই না রাখি বরং যখনই যে জিনিষের প্রয়োজন হবে আমরা তা নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করে দিব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখানে এই কথার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই যে, জামা'তবদ্ধ হয়ে কুরবানী করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং জামা'তের সকলে ***'মিন হাইসুল জামা'ত'*** অর্থাৎ সম্মিলিতভাবেও সবাই কুরবানী করে যাচ্ছে। একে অপরের জন্যও কুরবানীর মন-মানসিকতা থাকা চাই। অপরের প্রয়োজনে নিজেকে নিবেদিত রাখার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিৎ।

এই প্রেরণা যদি আমাদের জামা'তে উন্নতি করতে থাকে তাহলে জামা'তের অনেক অভ্যন্তরীন কোন্দল আপনা থেকেই নি:শেষ হয়ে যাবে। কিছু মানুষ বলে থাকে, যেহেতু আমাদের প্রাপ্য অধিকার এজন্য আমাদেরকে নিতেই হবে। অন্য যারা রয়েছে তারাও বলে যে, আমাদেরও অধিকার রয়েছে আর তা প্রমাণ করতে তা নেয়ার জন্য চেষ্টা করে। দু'জনই একই কথার উপর বিবাদ করতে থাকে আর এতে উন্নয়ন কর্মের জন্য নির্ধারিত যে সময় সীমা তা শেষ হয়ে যায়, উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলে। দু'জনেই যদি জেদের বশবর্তি হয়ে কাজ করে তাহলে কোন দিন আপোস-রফা হতে পারে না।

অতএব, খোদা তা'লার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস রাখলে, তিনি সব ধরণের ক্ষতি পুষিয়ে দেন। আর সেই বিশ্বাসে আস্থাশীল হলে, আমাদেরকে শান্তি এবং নিরাপত্তাদানকারী বৈশিষ্টের ধারক হয়ে নিজের অধিকারকেও যদি ছাড়তে হয়, তাহলেও তা ছাড়া উচিৎ। এমন চিন্তা-ভাবনা যখন সৃষ্টি হবে তখন দেখবেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের মাঝে ঈমানের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এইসব কথা অনুধাবনের তৌফিক দিন, আর সব ধরণের কুরবানী প্রদানকারী হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। চার হাজার বছর পূর্বের কুরবানীর শিক্ষা ঈদের দিনে শুধু একটি ছাগল কুরবানী করার মাধ্যমে গ্রহণ করবেন না বরং সেই কুরবানীকে আজও সর্ব ক্ষেত্রে সচল রাখায় সচেষ্ট হউন। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

এখন (খুতবা সানীয়ার পর) দোয়া করা হবে। আর দোয়ার মধ্যে শহীদদের পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন যারা এই বৃক্ষকে সতেজ রাখার জন্য নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, নিজের প্রাণের কুরবানী দিয়েছেন। আসিরানে রাহে মাওলাদেরকে (আল্লাহর পথে বন্দি) স্মরণ রাখবেন, তারা অনেক দিন ধরে কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করছেন। সৌদী আরবেও রয়েছেন আর পাকিস্তানেও রয়েছেন। মালি কুরবানীকারীদেরকেও স্মরণ রাখবেন, ওয়াকেফে জিন্দেগীদেরকে স্মরণ রাখবেন, তারাও বিভিন্ন স্থানে কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক অসুস্থ এবং কষ্টে নিপতিতদেরকেও স্মরণ রাখবেন, মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করবেন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি দেন এবং বিবেক-বুদ্ধি দান করেন আর এভাবে সকল মানবকুলের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করুন।

ভাষান্তর: মাহমুদ আহমদ সুমন

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

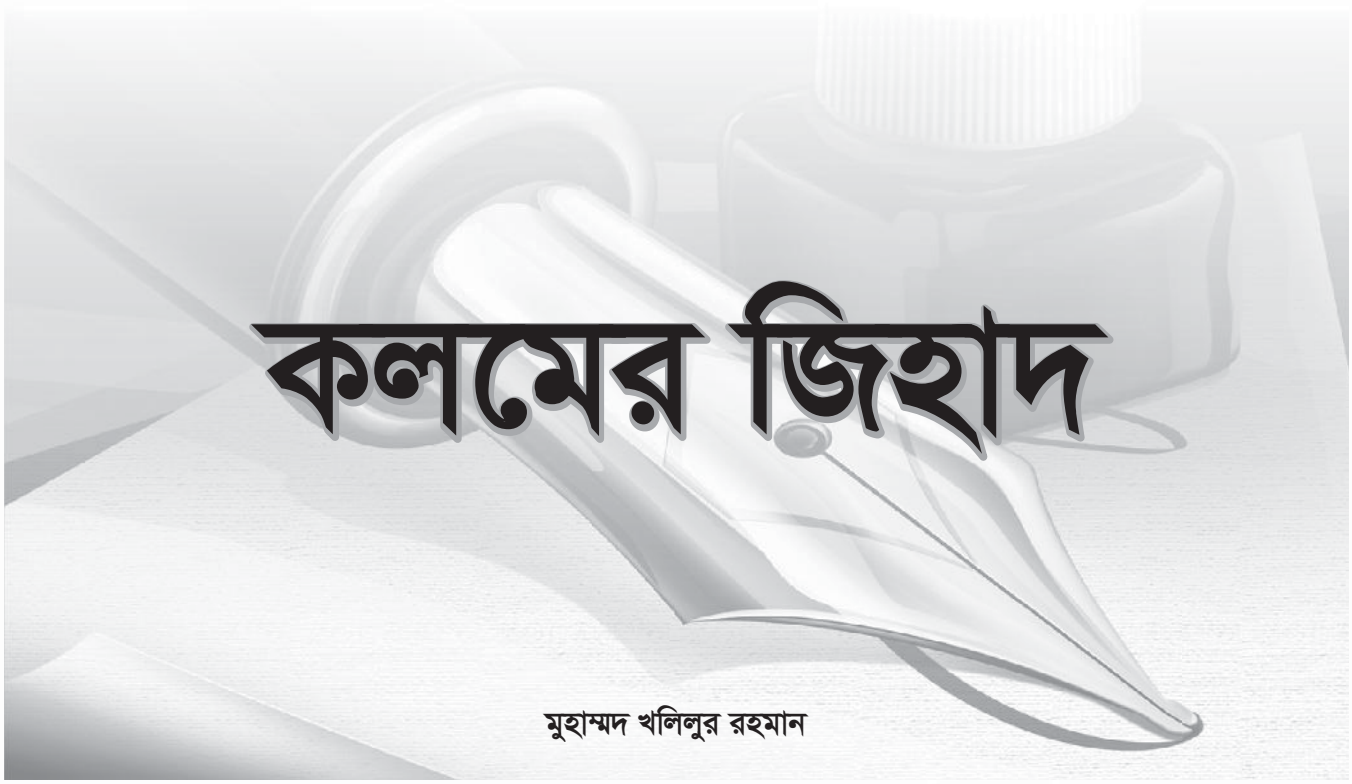

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–১৬)

'মুরতাদ' সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগীর মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দানের সমর্থনকারী প্রবক্তরা আর একটি হাদীসের ওপরে বেশী বেশী জোর দেন এবং নির্ভর করেন। উক্ত হাদীসটি হলোঃ "ইকরামা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন যে, হযরত আলীর (রা.) সম্মুখে কয়েকজন জিন্দীককে উপস্থিত করা হলে, তিনি সেই লোকগুলোকে জীবন্ত পুড়ে মারার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন যে, (আলীর জায়গায়) তিনি হলে এমন ধরনের হুকুম দিতেন না। কারণ, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, আগুনের শাস্তি দিতে পারেন কেবল আল্লাহ্। কিন্তু রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে কেউ ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।" (বুখারী)।

উপরোক্ত হাদীস এবং অনুরূপ অন্য কোন হাদীসের বর্ণনাগুলো পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং অন্যান্য হাসীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার পরিপন্থী হিসেবে প্রমাণিত। সেই সঙ্গে এরূপ হাদীসের বর্ণনাকারীর যুক্তিগত দুর্বলতা এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি–বিশিষ্ট হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। তদুপরি সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচার–বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এই হাদীসটি কোনক্রমেই গ্রহণ–যোগ্য হতে পারে না। গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রধান প্রধান কারণগুলোর সংক্ষিপ্ত–সার নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ প্রত্যেক মুসলমানকে এ কথা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে যে, ধর্মীয় মৌলিক বিধি–নিষেধের ক্ষেত্রে কোন হাদীসের বর্ণিত বিষয়ে সর্বাগ্রে পবিত্র কুরআনের অনুসৃত নীতি–নির্ধারণী নির্দেশাবলীকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন হাদীসের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের অনুসৃত নীতি–নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে সেই হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ "আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র আয়াতের বিরুদ্ধে কোন্ হাদীসকে (কথা বা বর্ণনাকে) বিশ্বাস করতে পারো?" (সূরা জাসিয়াঃ ৭)।

এই আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোন হাদীসের নির্দেশ গ্রহণ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, সত্য হাদীস হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নতের সেবক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীসের বিষয়–বস্তু কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হাদীসকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করা যাবে না। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য হবে না।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)– বলেনঃ

"আমার সহিত শত্রুতা করিয়া তাহারা কুরআন শরীফকেও ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি কুরআন শরীফ পেশ করি। ইহার বিপক্ষে তাহারা হাদীস পেশ করে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কুরআন শরীফের যে মর্যাদা আছে হাদীসের তাহা থাকিতে পারে না। হাদীসকে আমরা খোদার কালামের সমান মর্যাদা দিতে পারি না। হাদীস তৃতীয় স্তরের বিষয়। এই কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কোন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে হাদীস সহায়তা করে। কিন্তু সত্যের বিপক্ষে অনুমানের কোন মূল্য নাই। "নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না" (১০ঃ৩৭)।

বস্তুতঃ এই সম্বন্ধে তিনটি বিষয় আছে–প্রথম কুরআন, দ্বিতীয় রসুলুল্লাহ (সা.)–এর অনুষ্ঠিত কাজ বা সুন্নত এবং তৃতীয় হাদীস। কুরআন খোদা তা'লার পবিত্র বাণী; রসুলুল্লাহ (সা.)–এর প্রতি ইহা নাযেল হইয়াছিল। কুরআনের আদেশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য মহানবী (সা.) যাহা কিছু করিতেন তাহাই সুন্নত। কুরআন ও

"যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে, ভূ-পৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়? এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না।"

সুন্নত লোকদিগকে পৌঁছাইয়া দেওয়া আঁ-হযরত (সা.)-এর কাজ ছিল। এই কারণেই হাদীস সমূহ পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হওয়ার পূর্বেও ইসলামের যাবতীয় বিধান মানিয়া চলা সম্ভবপর ছিল। এখন একটা ধোকার বিষয় এই যে, তাহারা হাদীস ও সুন্নতকে মিলাইয়া ফেলে। বস্তুতঃ এই দুইট এক বিষয় নহে।

অতএব, কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী পরীক্ষা না করিয়া আমরা হাদীসকে কোন স্থান দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা এই যে, হাদীস পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী কোন হাদীস যতই দুর্বল বা বিকৃত বলিয়া প্রমাণিত হউক না কেন এবং ঐ হাদীসকে যতই নিম্ন শ্রেণীর বলা হউক না কেন, কুরআন ও সুন্নতের বিপরীত না হইলে, উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমার বিরুদ্ধবাদীগণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে কোন হাদীস যদি হাদীস পরীক্ষার নিয়মানুসারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা কুরআন শরীফের যতই বিরোধী হউক না কেন, তাহা মানিয়া লওয়া চাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিচার করুন। খোদার ভয় রাখিয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন, সত্য কোন দিকে? তাহারা ঠিক বলে, না আমার কথা ঠিক? আমি খোদার বাণী এবং তাঁহার পবিত্র রসূল (সা.)-এর সুন্নতকে (ব্যবহারিক জীবন) শ্রেষ্ঠ জানি। তাহারা লোকের নির্ধারিত নিয়মকে শ্রেষ্ঠ জানে, অথচ নিয়ম প্রণেতাগণের মধ্যে কেহই এই দাবী করেন নাই যে, খোদার বাণী পাইয়া তিনি হাদীস পরীক্ষার ঐ নিয়মগুলি উদ্ভাবন করিয়াছেন। ব্যাপার যদি ইহাই হয় যে, কুরআন ও সুন্নত ব্যতীত হাদীস পরীক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি প্রসূত আর কোন মাপকাঠি আছে, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি, শিয়া ও সুন্নী উভয়ের হাদীসগুলিকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করা হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেহ দেয় না।" (আহ্বান, মালফুজাত)।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসের গ্রন্থাবলী কয়েকশত বছর পর সংগৃহিত হয়েছিল। সেই কারণে হাদীস সংকলন-কারীদের পক্ষে ভূল-ভ্রান্তি হতেও পারে। কিন্তু পবিত্র কুরআন শরীফের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার ওপর ন্যস্ত। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেনঃ "নিশ্চয় আমরা এই 'যিকর' (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই ইহার হেফাজত-কারী (সংরক্ষণকারী)"। (সূরা হিজর ঃ ১০)।

তিনি বলেছেনঃ "এই কেতাবে কোন সন্দেহ নাই" (সূরা আল-বাকারা)। পক্ষান্তরে হাদীসের গ্রন্থাবলীর সংরক্ষণ সম্পর্কে এরূপ কোন ঐশী প্রতিশ্রুতি নেই। তাই হাদীসের বর্ণিত বিষয়াবলী তখনই বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হবে যখন সেগুলো হবে পবিত্র কুরআনের সংঙ্গে পুরাপুরিভাগে সংগতিপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যমূলক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বরাতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ অথবা মানবীয় কর্তৃপক্ষ মুরতাদ বা ধর্ম-ত্যাগকারীর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে পারে না। যে কোন মানুষ ধর্ম গ্রহণ করতে পারে এবং পছন্দ না হলে ধর্ম-বর্জন করতে পারে। এরই নাম ধর্মীয় স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। ইহকাল ও পরকালে ধর্ম-ত্যাগের শাস্তি দিবেন আল্লাহ্ তা'লা নিজেই।

মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কিত হাদীসটির বিপক্ষে পবিত্র কুরআনের কতকগুলো আয়াতের রেফারেন্স নিম্নরূপ। "কোন স্বচ্ছ মনের মানুষের পক্ষেই কুরআন করীমের নিম্নোল্লেখিত আয়াতগুলির সঙ্গে এই হাদীসটির খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে না

(সূরা নম্বরঃ পদ্ধতি অনুসৃত)ঃ

২ ঃ ৫৭,১০০,১০৯,২১৮,২৫৭,২৭৩

৩ ঃ ২১,৭৩,৮৬-৯২,১৪৫, ৪ঃ৮৩,১৩৮,১৩৯,১৪৬ ৫ ঃ ৫৫,৬২,৯১-৩,৯৯,১০০, ৬ঃ৬৭,১০৫-৮,১২৬, ৭ ঃ ১২৪-৯, ৯ ঃ ১১-১৪, ১০ ঃ ১০০-৯, ১৩ ঃ ৪১, ১৫ ঃ ১০, ১৬ ঃ ৮৩,১০৫-৭,১২৬, ১৭ ঃ ৫৫, ১৮ ঃ ৩০, ১৯ ঃ ৪৭, ২০ ঃ ৭২-৭৪, ২২ঃ ৪০, ২৪ ঃ ৫৫, ২৫ ঃ ৪২-৪,২৬ ঃ ১১৭, ২৮ ঃ ৫৭, ২৯ ঃ ১৯, ৩৯ ঃ ৩০-৪২, ৪০ ঃ ২৬,২৭, ৪২ ঃ ৭,৮,৪৮,৪৯, ৪৭ ঃ ২৬, ৫০ ঃ ৪৬, ৫১ ঃ ৫৭, ৬৪ ঃ ৯-১৩, ৬৬ ঃ ৭, ৮৮ ঃ ২২,২৩

এই আয়াতগুলির মধ্য থেকে এবং পূর্বে উদ্ধৃত কিছু কিছু আয়াতেরও বিশেষ নমুনা স্বরূপ নিম্নের এই পরিচ্ছেদটি আগে পাঠ করুন (৩ঃ৮৬-৯২)ঃ

"এবং যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা তার নিকট থেকে কখনও কবুল করা হবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে। কেমন করে আল্লাহ্ সেই জাতিকে হেদায়াত দিবেন যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই রসূল সত্য এবং তাদের প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এসেছ? বস্তুতঃ তিনি যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না। এরা এমন লোক যাদের প্রতিফল এই যে, তাদের ওপরে আল্লাহ্ এবং ফেরেশতারা এবং সমগ্র মানবজাতির লানত (অভিসম্পাৎ)। তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে, তাদের ওপর থেকে শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। তবে, ঐ সকল লোক ব্যতীত যারা অতঃপর তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঈমান

আনার পর, তারপর অস্বীকারে আরও বেড়ে গেছে, তাদের তওবা আদৌ কবুল করা হবে না; বস্তুতঃ তারাই পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় যারা অস্বীকার করেছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো নিকট থেকে পৃথিবী–ভরা স্বর্ণও কবুল করা হবে না, যদিও তা মুক্তিপণ হিসেবে তারা পেশ করে। এরাই এমন যাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৬–৯২)

এই আয়াতগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে, কোন মানুষ অপর কোন মানুষকে ধর্ম পরিত্যাগের জন্য কোন শাস্তি দিতে পারে না। 'তারা ওতে দীর্ঘকাল ধরে থাকবে' কথাগুলি দ্বারা পরিস্কারভাবে পরকালের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। 'আল্লাহ্‌র লানত (অভিসম্পাৎ)' এর ব্যাখ্যায় কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষ এটা কল্পনাও করতে পারে না যে, এর দ্বারা 'মুরতাদ' বলে বিবেচিত কোন মানুষকে হত্যা করবার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদন্ডের কোনও উল্লেখই করা হয়নি এখানে। যদি তা–ই হতো তাহলে, আইনের অবশ্যপূরণীয় শর্ত হিসেবে শাস্তিকে অবশ্যই পরিস্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হতো, যেমনটি করা হয়েছে অন্য সমস্ত 'হুদুদ' (পবিত্র কুরআনে প্রদত্ত বিভিন্ন শাস্তির বিধান)–এর ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, পবিত্র কুরআন ঐ সকল লোকের পক্ষে তওবা (অনুতাপ) করার এবং তার ফলে, খোদা তা'লার কাছে তাদের ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা বলেছে। কাউকে যদি হত্যাই করা হয়, তাহলে সে কি করে তওবা করবে এবং এই পৃথিবীতে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে?

ধর্ম–ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড–এই মতের প্রবক্তাদের এটা বিবেচনা করে দেখা উচিৎ যে, তাদের সমর্থনে এই হাদীসটি যদি 'সহীহ' বলেই ধারণা করা হয়, তাহলে এই হাদীসের সঙ্গে কুরআন মজীদের যে প্রত্যক্ষ বিরোধ , তার ফয়সালা হবে কিভাবে? বিশেষ করে, ওপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে তাদের উচিত তাদের মতটাকে পুনরায় বিবেচনা করে দেখা এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে সেগুলির ওপরে আবারও বিচার–বিশ্লেষণ করা। কোরআন করীমের এই সমস্ত সুস্পষ্ট নির্দেশের চাইতে একটা সন্দেহজনক হাদীসের ওপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা কি কারো পক্ষে সম্ভব? কুরআন করীমে তো বলা হয়েছেঃ

"যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তাহলে, ভূ–পৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনতো। সুতরাং তুমি কি লোকদেরকে বাধ্য করবে যে পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়? এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না। এবং তিনি তার কোপ তাদের ওপরে বর্ষণ করেন যারা বুদ্ধি খাটায় না।" (ইউনুসঃ ১০০-১)।

খোদা যখন নিজেই মানুষের ওপরে ঈমান আনার জন্য জোর খাটান না, তখন আমরা কে যে ঈমান আনার জন্য মানুষের ওপরে তরবারি উঠাব অথবা মওদুদীর ইঁদুর–মারা–ফাঁদ পাতবো? ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ডের প্রবক্তাদের সমস্যা হচ্ছে, তারা এই বিষয়ে রসুলে পাক (সা.)–এর শত শত বছর পরে সংকলিত হাদীসগুলোকেও আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে থাকেন–যেগুলো কিনা বোধগম্য কারণেই পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী।" [১৫]

[নোটঃ হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে। ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস ('সিহাহ ছেত্তা') সংকলন–কারীগণের নাম ঃ (১) আল বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিঃ) (২) মুসলিম, মৃত্যু ২৬১ হিঃ (৩) আবু দাউদ, মৃত্যু ২৭৫ হিঃ (৪) আল–তিরমিযী, মৃত্যু ২৭৯ হিঃ (৫) আল–নাসাঈ, মৃত্যু ৩০৩ হিঃ (৬) ইবনে মাজা, মৃত্যু ২৭৩ হিঃ। উল্লেখ্য যে, শিয়াদের হাদীস কেবল হযরত আলী (রা.) এবং তাঁর অনুসারীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সংকলিত। শিয়াদের নিজস্ব হাদীস–গ্রন্থ রয়েছে। একটি বিখ্যাত শিয়া হাদীসের নামঃ আল–কাফী।]

তৃতীয়তঃ 'মুরতাদ' সংক্রান্ত হাদীসটি 'সুন্নাহ'–এর ভিত্তিতে বিচার–বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। 'সুন্নত' হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর ব্যবহারিক জীবন–পদ্ধতি যা তিনি কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যা–স্বরূপ কার্যতঃ প্রদর্শন করেছেন। পবিত্র কুরআনের পর সুন্নতই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'লার প্রধান অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌ তা'লার নির্দেশ হলোঃ "তুমি বলো, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসো, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করো, তাহ'লে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" (আলে ইমরানঃ ৩২)। পৃথিবীতে আগমনকারী নবী–রসূলগণ সমকালীন লোকদের হেদায়েতের জন্য জীবন–ভর চেষ্টা–প্রচেষ্টা করেছেন যাতে তারা ভ্রান্ত পথ পরিবর্তন করে সঠিক পথ অবলম্বন করে। তাঁদের সেই চেষ্টা–প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীগণ প্রচন্ড বাধা–বিপত্তি সৃষ্টি করেছে এবং হাসি–ঠাট্টা, গালি–গালাজ করেছে (সূরা ইয়াসিনঃ ৩১)। এরূপ পরিস্থিতিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্‌ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "অতএব (হে মুহাম্মদ) তুমি একজন উপদেষ্টা মাত্র এবং তুমি তাদের জন্য রক্ষী নও।" (সূরা আল গাশিয়াঃ ২৩)। সুতরাং ধর্মীয় স্বাধীনতার এই সুমহান নীতিই ইসলামের প্রবর্তক জীবন–ব্যাপী বাস্তবায়ন করেছেন এবং তাঁর ব্যবহারিক জীবনের একদিনের ঘটনা দ্বারাও মুরতাদকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই।

[চলবে]

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

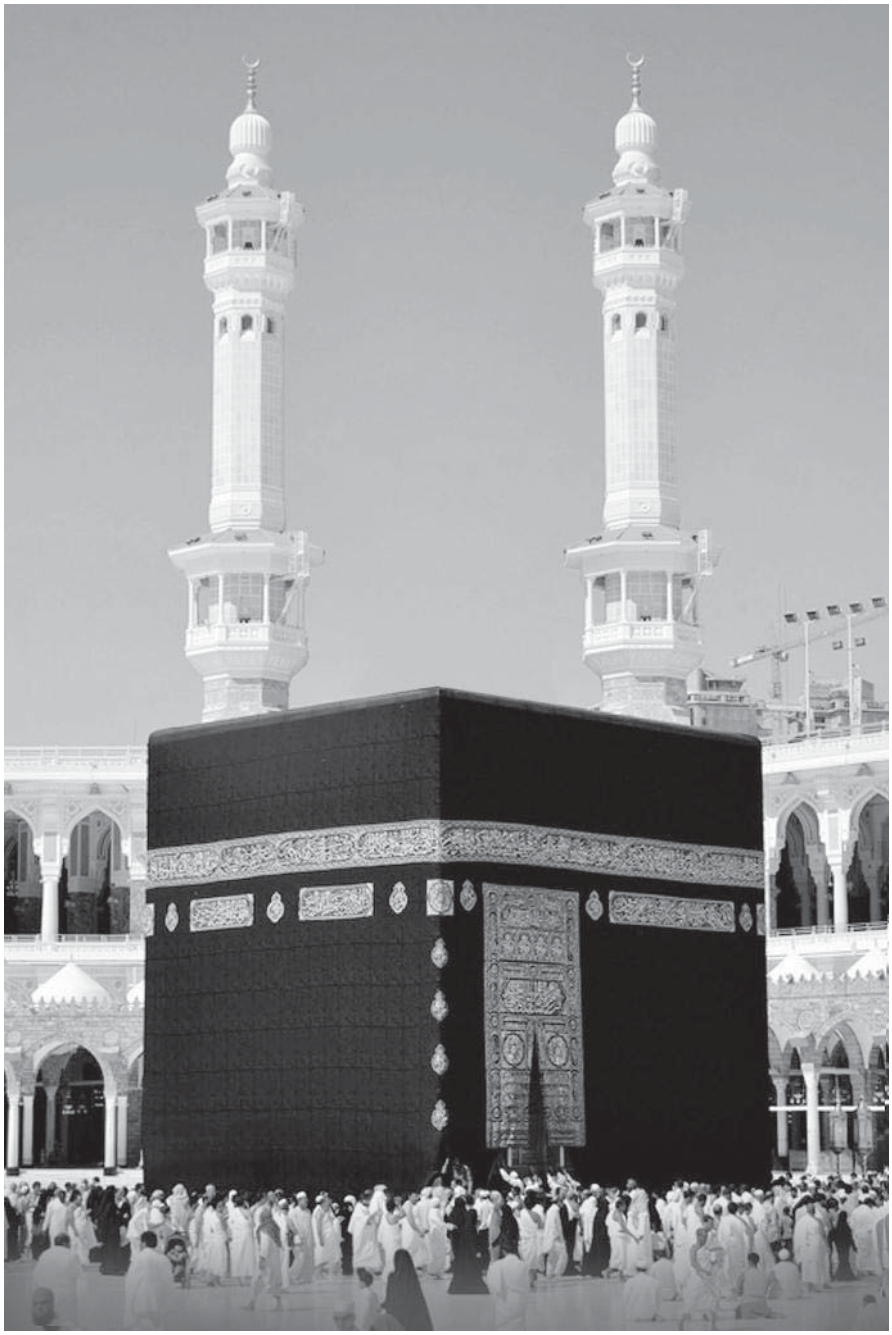

অন্তকরণের হজ্জ ক'জন করে

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্‌পাকের পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ এবং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে, তবে আল্লাহ্‌পাক যেহেতু বান্দার অন্তর দেখেন তাই তিনি অন্তকরণের হজ্জকেই গ্রহণ করেন। যাদের অন্তর অপবিত্র তাদের সাথে আল্লাহ্‌পাকের যেমন কোন সম্পর্ক নেই তেমনি তারা কুরআনের শিক্ষার ওপর আমলের ক্ষেত্রেও থাকে উদাসীন। যেভাব পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আসলে তাদের হৃদয় এ কুরআন থেকে উদাসীন। আর এ ছাড়াও তাদের আরো অনেক মন্দ কর্ম রয়েছে, যা তারা করে চলেছে' (সূরা আল মোমেনুন: ৬৪)। অপর দিকে যারা মু'মিন তাদের অন্তর থাকে পবিত্র আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেছেন, 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুপ্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা আল ফজর: ২৮-৩১)।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার ওপর পূরোপুরি সন্তুষ্ট। এমন অবস্থাকে বেহেশতি অবস্থা বলে, যে আত্মার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট সেই আত্মাও তার রবের প্রেমে এমনভাবে বিলীন ও একীভূত হয়ে যায় যে, এমন অন্তর তখন আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। আসলে যারা আল্লাহ্‌পাকের মুমিন বান্দা তারা ইহকালেই তাঁর কাছ থেকে 'হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা' এই আহ্বানের ডাক শুনতে পায়। সে এই জগতেই আল্লাহ্‌পাকের জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং তার অন্তর সবর্দা তাঁর যিকিরে মশগুল থাকে। সে কথা বলবে ঠিকই কিন্তু তার কথার মধ্যে এমন পবিত্রকরণ শক্তি থাকে যা অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায় না। মূলত তার কথা, কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই তখন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য হয়।

কেননা অন্তর থেকে যদি আল্লাহ্‌র জন্য করা না হয় তা কোন কাজে লাগতে পারে না, আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের আল্লাহ্‌ভীতিই পৌঁছে' (সূরা হজ: ৩৮)। এ আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায়, মানুষের বাহ্যিক কাজকর্ম দিয়ে আল্লাহ্‌কে কখনই সন্তুষ্ট করা যাবে না বরং আল্লাহ্‌কে খুশি করাতে হলে চাই পবিত্র অন্তর আর সেই পবিত্র অন্তর থেকে যখন আল্লাহ্‌র জন্য কিছু করা হবে তখনই না আল্লাহ্‌পাক তা গ্রহণ করবেন।

আসলে ঈদুল আযহাতে এই যে আমরা লাখ লাখ পশু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করি তাতে কি তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয়? মোটেও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'লা

‘আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন’

পশুর রক্ত ও গোশত আমাদের কাছে চান না বরং তিনি চান আমাদের অন্তরের কুরবানী। যে কুরবানী কেবল মাত্র হৃদয় থেকে করা হয় তাকেই তিনি গ্রহণ করেন। তেমনি আমরা যে প্রতি বছর হজ্জ করতে যাই তাদের মধ্যে ক’জন আছেন যারা অন্তকরণের হজ্জ করতে যান? আগে আমার দিল কাবাতে তাওয়াফ করতে হবে। আমার অন্তরই যে কাবাতুল্য। আমার অন্তরকে পরিষ্কার না করে আমি যদি চলে যাই পবিত্রময় আল্লাহ্‌র সাথে স্বাক্ষাত করতে, যার কাছে অপবিত্রতার কোন মূল্য নেই তাহলে কি আমি কোন কিছু লাভ করতে পারব?

আল্লাহ্‌পাকের কাছে বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই, তিনি অন্তর দেখেন। যেমন মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন’ (মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, প্রথম খন্ড)। কে কোন নিয়্যতে হজ্জে যাচ্ছি তার খবর কিন্তু আল্লাহ্‌পাক ভালো করেই জানেন, কারণ অন্তরের কথা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। যেভাবে কুরআনে বলা হয়েছে ‘তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ্ জানেন’ (সূরা আলে ইমরান: ৩০)।

তাই হজ্জে যাওয়ার পূর্বে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করা উচিৎ যে, হে আমার আত্মা, তুমি কি সেই পবিত্র স্থান তাওয়াফ করার যোগ্য? আমার কাছে বৈধ-অবৈধ অনেক অর্থ সম্পদ থাকতে পারে তাই বলে কি আমি প্রতি বছরই হজ্জে চলে যাব, এটা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না বরং তিনি চান অন্তর যেন পরিষ্কার হয় আর আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার অধিকার যেন পূর্ণভাবে প্রদান করা হয়। তা না হলে এই বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই।

ইসলামে পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব অনেক। এ সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত পালন করে আর কোন ধরনের অশালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্জ থেকে ফিরে এলো’ (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অনেকেই পয়সার জোরে প্রতিবছরই হজ্জ সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন। হজ্জ পালন করে আসলেই নিষ্পাপ হয়ে যাবে, এমন এক অদ্ভুদ মন-মানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। অথচ দেখা যায় হজ্জ থেকে ফিরে এসে পূর্বের স্বভাবেরই বহির্প্রকাশ ঘটে। কেউবা ফিরে এসে হাজী নামটিকে ব্যবসার খাতিরে ব্যবহার করেন আবার কেউ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করেন।

মহান আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হজ্জ করার সামর্থ দান করেছেন তারা ইতোমধ্যে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা শুরু করেছেন, তাদের জন্য আমাদের দোয়া থাকবে, আপনাদের হজ্জ যেন অন্তকরণের হজ্জ হয়। সেই সাথে পূর্বের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মু’মিন-মুত্তাকী হয়ে বাকী জীবন যেন অতিবাহীত করতে পারেন। যদি এমনটি হয় যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে পূর্বের মতই জীবন পরিচালিত করতে থাকলাম তাহলে তার হজ্জ করা আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য রাখে না। আল্লাহ্‌র সাথে যদি প্রেমময় এক সম্পর্কই সৃষ্টি না হয় তাহলে এই হজ্জ বৃথা। এমন লোকদের খুব কমই দেখা গেছে যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে কেউ আল্লাহ্‌প্রেমিক হয়েছেন, অন্তর পবিত্র হয়েছে, মানুষকে ভালবাসতে শিখেছেন, আল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছেন, অঢেল সম্পত্তির মায়া ছেড়ে দরদী নবী (সা.)-এর মত জীবন কাটিয়েছেন, নিজে না খেয়ে অনাহারীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন।

প্রত্যেক হাজীদের আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, আমি কি আল্লাহ্ প্রেমিক হতে পেরেছি? আমার হজ্জ কি অন্তকরণের হজ্জ হয়েছে? আমার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমময় সম্পর্ক তৈরী হয় তাহলেই আমাদের হজ্জ খোদার দরবারে গৃহিত হবে। কারো হৃদয়ে যদি হজ্জ করার বাসনা থাকে আর সে অনুযায়ী আল্লাহ্‌পাকের সাথে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলি তাহলে বায়তুল্লায় উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে হজ্জের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক রাখেন। আমি হজ্জে যাব আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আর তারই বান্দা আমার প্রতিবেশী না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে এটাকে কি আল্লাহ্‌পাক মেনে নিবেন?

একবার মহানবী (সা.) বায়তুল্লাহর জিয়ারত না করেও আল্লাহ্ তার হজ্জ কবুল করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ৪৮ নম্বর সূরায় এর বর্ণনা রয়েছে। তাযকেরাতুল আউলিয়াতেও একজন আল্লাহ্ প্রেমিকের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার কারো হজ্জ গ্রহণ হয়নি কেবল একজনের হজ্জ আল্লাহর দরবারে গৃহিত হয়েছিল, যে ব্যক্তির হজ্জ গ্রহণ করা হয়েছিল তিনি হজ্জের সব প্রস্তুতি নেয়া সত্তেও হজ্জে যেতে পারেননি, তার হৃদয় যেহেতু আল্লাহ্ প্রেমিক ছিলেন তাই তার মাধ্যমেই সে বছরের হজ্জ পূর্ণ হয়।

তাই আমাদের আত্মাকে পবিত্র করতে হবে আর আত্মা তখনই পবিত্র হতে পারে যখন আমরা হালাল রিযিক গ্রহণ করবো। হালাল রিযিক ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয় অন্তকরণের পবিত্রতা। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আমাদের মত একটি গরীব দেশ থেকে হজ্জে যান তাদের ক’জন বুকে হাত দিয়ে আল্লাহ্‌কে স্বাক্ষী রেখে এই কথা বলতে পারবেন যে, আমি শতভাগ হালাল রিযিক গ্রহণ করি? বা আমার এই অর্থ সম্পদ শতভাগ হালাল উপার্জন? আল্লাহ্‌পাক সকলকে অন্তকরণের হজ্জ পালন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

masumon83@yahoo.com

দীর্ঘ জীবন লাভে মধুর উপকারিতা

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ্

যুগ যুগ ধরে মানুষ মধু ব্যবহার করে আসছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নিয়মিত মধু খেলে মানুষ নিরোগ, বলবান ও দীর্ঘজীবী হয়। মধুর উপকারিতা ও গুণাগুণ অনেক। কুরআন ও হাদীসে মধুর উল্লেখ রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এতে অর্থাৎ মধুর মাঝেই মানুষের আরোগ্য নিহিত। পবিত্র কুরআন করীমের সূরা আন নাহলের ৬৯, ৭০নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–'আর তোমার প্রভূ-প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি (এই বলে) ওহী করলেন, তুমি পাহাড় পর্বতে ও গাছ পালায় এবং (সেইসব) মাচাতেও ঘর তৈরী কর (যেগুলো মানুষ লতাগুল্মের জন্য) বানিয়ে থাকে। এরপর সব ধরনের ফলমূল থেকে খাও এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশিত পথ ধরে সবিনয়ে এগিয়ে চল। এদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়ে থাকে। এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে এক নিদর্শন।"

এই আয়াতদ্বয় থেকে এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে তার জীবন ধারণ পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'লা মৌমাছিকে অনুপ্রাণিত করেন। বিভিন্ন ফলমূল থেকে এরা খাদ্য গ্রহণ করার জন্য এবং তারপর তারা দৈহিক গঠনশৈলী এবং আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক শিক্ষা প্রণালী যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে সেই সবের সমন্বয়ে সে তার সংগৃহীত খাদ্যকে মধুতে পরিণত করে। এ বছরের মে মাসের শেষের দিকে শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব সৈয়দ কাসেম আহমদ শাহ সাহেব যখন বাংলাদেশের শূরায় আসেন তখন খাকসার উনার ডিউটিতে ছিলাম। তখন দেখতাম তিনি নিয়মিত মধু ব্যবহার করতেন। তিনি এক দিন এ অধমকে মধু খাওয়ার দোয়া বলার জন্য বলেন, যা সূরা নাহলের ৭০নং আয়াতে শিখানো হয়েছে। যখনই আমরা মধু পান করি তখনই এই দোয়াটি পড়া উচিৎ, "হুয়া শিফাউল্লিন্নাস" অর্থাৎ এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য।

যদি আমরা হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখি যে, হযরত রসূল করীম (সা.) মধু ব্যবহার করতেন ও ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি তিনি অনেক রোগ ব্যাধির জন্য লোকদের মধু ব্যবহার করতে বলেছেন। রসূল করীম (সা.) এর মধু ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস এখন আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) মিষ্টিজাত দ্রব্য ও মধু বেশী পছন্দ করতেন। মধু সম্পর্কে আরো একটি হাদীস যা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা.) বলেন, আমি নবী করীম (সা.)কে বলতে শুনেছি– তোমাদের ঔষধসমূহের কোনটির মধ্যে যদি কল্যাণ বিদ্যমান থেকে থাকে তাহলে তা রয়েছে শিংগাদানের মধ্যে অথবা মধু পানের মধ্যে কিংবা আগুনের দ্বারা ঝলসিয়ে দেয়ার মধ্যে। তবে তা রোগ অনুযায়ী হতে হবে। আর আমি আগুন দ্বারা দাগ দেওয়াকে পছন্দ করি না।

অপর একটি হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, পেটের অসুখেও রসূল করীম (সা.) মধু ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর নিকটে এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেটে অসুখ হয়েছে। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি দ্বিতীয়বার আসলে তিনি (সা.) বলেন, তাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসলে তিনি (সা.)

বলেন, তাকে মধু পান করাও। এরপর লোকটি পুনরায় এসে বললেন, আমি অনুরূপই করেছি। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, আল্লাহ্ সত্য বলেছেন। কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলছে। তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু পান করালো। এবার সে আরোগ্য লাভ করলো। উপরোক্ত তিনটি হাদীসই বুখারী শরীফ এর কিতাবুত তিব্ব অধ্যায়ে রয়েছে।

আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মধুর ব্যবহার রয়েছে। মধু সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যাদি ও এর ব্যবহার বিধি উল্লেখ করছি। মধু বিভিন্ন রং ও গন্ধের হয়ে থাকে। কিন্তু সকল প্রকার মধুই মানবের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

আট প্রকারের মধু আছে। বড় বড় মৌমাছি তৈরী করে মাক্ষিক মধু, ছোট মৌমাছি বা ভোমরার তৈরি ভ্রামর মধু। আবার কোন কোন ফুল হতে আপনা আপনিই মধু ঝড়ে পড়ে। তাকে বলে মকরন্দ। মধু খুবই পুষ্টিকর এবং সবরকম চোখের রোগের উপকারী। যারা রোগাক্রান্ত তারা মধু খেয়ে কিছুটা মোটা হতে পারেন। আবার পুরনো মধু খেলে যারা মোটা তারা কিছুটা শুকাবেন। অনেক রোগের ঔষধই মধু। গরম দুধের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে তা যেমন তৃপ্তিকর তেমনই পুষ্টিকর, কোষ্ঠ ও রক্ত পরিষ্কারক, শক্তি বৃদ্ধিকারক। মধুর গুণাবলী অসংখ্য তার মাঝে কতগুলো নিম্নরূপ–

(১) শরীরের বাইরের কোন ক্ষতে মধু লাগালে অনেক সময় মলমের চেয়ে বেশী উপকার পাওয়া যায়। (২) পানির সাথে অল্প মধু মিশিয়ে খেলে তা যেমন তৃপ্তিপর তেমনি পুষ্টিকরও। (৩) চায়ের সাথে মধুর রস ও আদার রস মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশির উপসম হয়। (৪) মধু পানিতে মিশিয়ে কুলি করলে গলার স্বর পরিষ্কার হয়, টনসিল ভালো হয়। (৫) শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য মধু শক্তিশালী আহার্য। দুর্বল শিশুকে দু'এক ফোটা মধু দুধের সাথে মিশিয়ে দিনে দু'বার খাওয়ালে তার স্বাস্থ্য ভালো হয় ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। (৬) তুলসি পাতার রসের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশি, গলা ব্যাথা দূরীভূত হয়।

(৭) গরম পানিতে মধু দিয়ে কুলি করলে গলগন্ড রোগের উপকার হয়। (৮) এক কাপ দুধে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খেলে শক্তি বৃদ্ধি পায়। (৯) মধুর সাথে গুড় মিশিয়ে খেলে বমি বন্ধ হয়ে যায়। (১০) টাটকা মাখনের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে ক্ষয় রোগের উপকার হয়। (১১) এক চামচ মধু দুই চা চামচ পাতিলেবুর রসের সাথে মিশিয়ে ব্লাড প্রেসারের রোগীরা খেলে ব্লাড প্রেসার কমে। (১২) প্রতিদিন সকালে ঠান্ডা পানিতে দুই চামচ মধু মিশিয়ে খেলে চুলকানি, ফুসকড়ি, ব্রন প্রভৃতি ত্বকের রোগ একেবারে মূল থেকে সেরে যায় ও আরাম বোধ হয়। (১৪) সকালে এক কাপ গরম বা ঠান্ডা পানির সাথে এক চামচ এবং রাতে এক কাপ দুধের সাথে এক চামচ মধু খেলে অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা দুর হয়। (১৫) ভেজা মুখে মধু মেখে কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেললে ত্বক সুন্দর ও মসৃণ হয়। মুখের ত্বকে একটা তাজা ও সতেজভাব আসে, এছাড়া রূপচর্চায় মধুর আছে আরো বহুবিধ ব্যবহার।

মধু সহজে হজম হয় এটি অত্যন্ত হালকা ও শরীরের জ্বালা-পোড়া কমায়। শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদরোগের জন্য উপকারী। নানা প্রকার অসুখ সারাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মধুর জুড়ি মেলা ভার। মধুর তুলনা শুধু মধুই। মধু আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ এক নেয়ামত, এই নেয়ামতকে কাজে লাগিয়ে এ থেকে আমাদের কল্যাণ মন্ডিত হতে হবে।

নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে পর্দা করা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন-

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যারা বলে, ইসলামে মুখমন্ডল ঢাকার কোন আদেশ নেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কুরআন করীম তো বলে, সৌন্দর্য গোপন রাখ। আর সবচেয়ে সৌন্দর্যের জিনিস হলো মুখমন্ডল। মুখমন্ডল ঢাকার যদি আদেশ না থাকে তাহলে সৌন্দর্য আর কি জিনিস যা ঢাকার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ সীমা পর্যন্ত মানতে পারি, মুখমন্ডলকে এভাবে ঢাকা হোক যেন এর সুস্থতার ওপর কোন মন্দ প্রভাব না পড়ে, যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া হয় অথবা আরবী মহিলাদের রীতি অনুযায়ী নিকাব বা ঘোমটা বানিয়ে নেয়া যায়, যাতে চোখ ও নাকের নথ যুক্ত থাকে। কিন্তু মুখমন্ডলকে পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) পর্দার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো বলেন– "কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, গর্দান ও কানের আগা পর্যন্ত চেহারা বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে।" (আল ফযল ৮ নভেম্বর, ১৯২৪)

নবীনদের পাতা-

দোয়ার দ্বারা মানুষের হৃদয় তরতাজা হয়

বুশরা মজিদ, চট্টগ্রাম

আমরা যখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হই তখন এই অঙ্গিকার করি যে, "বিনা ব্যাতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়ব, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়ব, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করব ও এস্তেগফার পড়বে, ভক্তিপ্লুতে হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করব।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বয়আতের শর্তে আমাদেরকে এ সকল বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদেরকে এ সকল নির্দেশসমূহ পালন করতে বলেছেন। একজন আহমদী মুসলমানের কেমন হওয়া উচিত, কি তার দায়-দায়িত্ব তা তিনি তাঁর বয়আতের শর্ত সমূহে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই আহমদী হিসেবে আমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নামায কায়েম করা। তারপর সাধ্যমত যেন আমরা তাহাজ্জুদ নামায পড়ি। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তাহাজ্জুদ গুজার বান্দাকে খুবই ভালোবাসেন।

আমাদের উচিত, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা। বেশী বেশী দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করা যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'লার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আমাদের সব সময় ইস্তেগফার পড়া উচিত। কেননা ইস্তেগফার ব্যতীত হৃদয় কলুষ মুক্ত হয় না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ইস্তেগফার হলো এক প্রকার ঢাকনা। যার মাধ্যমে হৃদয়ে নোংরামি প্রবেশ করতে পারে না। তারপর আমাদেরকে বেশী বেশী আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও প্রশংসা করা উচিত। একজন আহমদীর যে দায়িত্ব তা হলো ইসলাহ্ বা আত্মসংশোধন।

বর্তমানে আমাদের হুযূর (আই.) আমাদের আত্মসংশোধনের জন্য এতো নসিহত করছেন, যার ফলে স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের নিজেদের আত্মসংশোধন হল নিজের নফ্‌সকে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত করে, সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে পরিচালিত করা। সকল প্রকার পাপ কাজ এবং শয়তানী প্ররোচনা হতে নিজেকে পবিত্র রাখা। আর এর জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা হল দোয়া। আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্‌র দরবারে ঝুঁকতে হবে। নিজের সংশোধন এবং ঐশী কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে হবে। আমাদের মূল অস্ত্র হলো দোয়া। দোয়া হল পানির ন্যায়। পানির দ্বারা যেমন গাছ তরতাজা হয়, তেমনি দোয়ার দ্বারা মানুষের হৃদয়ও তরতাজা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি এতো অনুগ্রহ করেছেন যে, প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে নিজেদের ঈমান বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে হুযূর (আই.) সারা বিশ্বের আহমদীদের জন্য জুমুআর খুতবা দিয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। কাজেই, তাঁর সকল খুতবা সরাসরি শোনা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

বিনয়ী ও নম্র হোন, গীবত পরিহার করুন

শারমিন আক্তার, তেজগাঁও, ঢাকা

গীবত করাকে ইসলাম কঠোরভাবে বারণ করেছে। গীবতের পরিণাম, অহংকার, রাগ সংবরণ এবং বিনয়ী সম্পর্কে হুযূর (আই.) সবসময় আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন। তিনি আমাদেরকে এ নসীহতই করছেন যে, আমরা যেন একে অপরের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করি। কোন কথা শুনে অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে চাইলে বিনয়ী হওয়া শর্তযুক্ত। অহংকার আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। জামা'তের সদস্য ও কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ অবস্থানে বিনয় অবলম্বন করা উচিত।

আমাদের সকলের উচিৎ নিজেদের রাগ সংবরণ করা। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আসুন, আমরা সবাই নিম্নের আয়াত গুলো আমল করার চেষ্টা করি এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হই।

১। "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মার্জনা করে। আর আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালোবাসেন" (আলে ইমরানঃ ১৩৫)।

২। "অতএব তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে। আর অহংকারীদের ঠাঁই অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট" (সূরা নাহলঃ ৩০)।

৩। "তবে (তারা মনে রাখে) অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকু যতটুকু সেই অন্যায়টি হয়ে থাকে। কিন্তু (অন্যায়কারীকে) শুধরানোর লক্ষে যে ক্ষমা করে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (সূরা আশ শুরাঃ ৪১)।

৪। "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। (কেননা) কোন কোন সন্দেহ অবশ্যই পাপ। আর কারও ওপর গুয়েন্দাগিরী করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বার বার তওবা গ্রহণকারী ও বার বার কৃপাকারী" (সূরা আল হুজরাতঃ ১৩)।

৫। "আর রহমান (আল্লাহ্‌র) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্র হয়ে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম" (সূরা ফুরকানঃ ৬৪)।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার এবং গীবত পরিহার করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

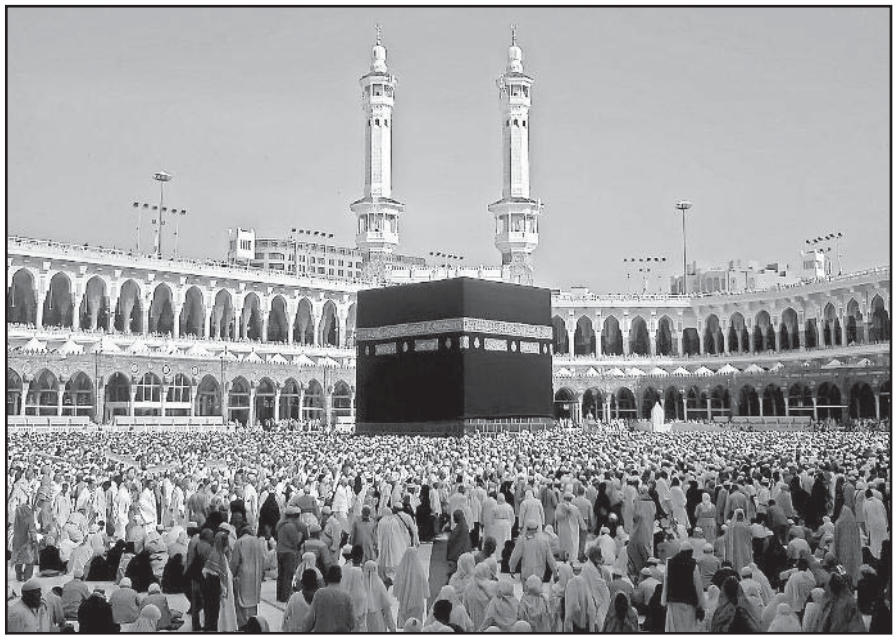

ইসলামে পবিত্র হজ্জের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, আর আল্লাহ্ তা'লার জন্য সেই (কাবা) ঘরের হজ্জ করা লোকের জন্য ফরয, যে ব্যক্তি সে বিষয়ে ক্ষমতা রাখে (সূরা আলে ইমরান : ৯৮)

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে একটি। যার হজ্জে যাওয়ার ক্ষমতা এবং সুযোগ আছে তার উপর জীবনে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। হজ্জের আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প বা ইচ্ছা করা। সহজ ভাষায় ইসলামী পরিভাষায় শরিয়তের বিধান অনুযায়ী কাবা শরীফ দর্শনের উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলে।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করে এবং কোন বিবাদ বিসংবাদ ও পাপ করে না, সে নবজাতকের ন্যায় (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে। (বুখারী ও মুসলিম) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জ না করে তবে সে খ্রিষ্টান ও ইহুদীর ন্যায় মৃত্যুবরণ করে। (তিরমিযী)। এই সব বর্ণনা থেকে জানা দেখা যায় যে, যার যাওয়ার ক্ষমতা আছে অথবা পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের খরচ বাদেও হজ্জে যাওয়ার অর্থ আছে, সফর করার মত স্বাস্থ্য থাকে এবং যাত্রা পথে কোন প্রকার নিষেধ বাধা যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে হজ্জ করতে হবে। এহেন অবস্থায় হজ্জ পরিত্যাগ করলে নামায, রোযা, ত্যাগকারীর ন্যায় সে গুনাগার হবে। যারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজ পরিবার পরিজন এবং আরাম আয়েশকে উপেক্ষা করে হজ্জের জন্য সফর করবে তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, হজ্জের সফরের বিনিময় হল জান্নাত। হজ্জের প্রধান উদ্দেশ্যে হল একত্ববাদকে কায়েম করা। আল্লাহ্ এক এবং সমগ্র মানব একজাতি, হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করে দুনিয়ার সকল মুসলমানকে এক কেন্দ্র এবং এক ইমামের অধীন হয়ে থাকার শিক্ষা দেয় হজ্জ। এছাড়া প্রত্যেক পুরুষকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায়, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে হাজেরার (রা.) ন্যায়, প্রত্যেক যুবককে ইসমাঈল (আ.)-এর মত আল্লাহ্‌র রাস্তায় যথা সর্বস্ব কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ধনীর ধনের এবং আভিজাত্যের গর্ব বিসর্জন দিয়ে কাফনের ন্যায় সাধারণ সাদা বস্ত্র পরিধান করে, নতশিরে সকলের সঙ্গে একত্ব হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সাদা, কালো, ধনী-দরিদ্র, রাজা, প্রজা, বিদ্বান-মূর্খ একত্রিত হয়ে ঘোষণা করতে হবে, লাব্বায়েক, হে আল্লাহ্! আমরা উপস্থিত। তোমার কোন অংশী নেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও আশীষ এবং আধিপত্য একমাত্র তোমারই।

আমাদের সমাজে যে বিষয়টি সচরাচর দেখা যায়, সেটি হচ্ছে অনেক বৃত্তবান লোক রয়েছে, যারা হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে কিন্তু হজ্জ পালন করে না। আবার কেউ কেউ রয়েছেন, লোকদেরকে দেখানোর জন্য হজ্জ পালন করে থাকে। লোক দেখানোর জন্য যারা হজ্জ করে থাকে তাদের হজ্জ প্রকৃত হজ্জ নয়।

সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ পালন করা করা উচিৎ আর এর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত হজ্জ পালনকারী বানান এবং এর গুরুত্ব যেন আমরা বুঝতে পারি, আর সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের হজ্জ পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মৌলবী ফরহাদ আলী
ধানীখোলা, ময়মনসিংহ

প্রত্যেক সামর্থ্যবান লোকদের হজ্জ করা ফরয

বিশ্বের মুসলিম জাহানের জন্য হজ্জ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হিসেবে পরিচিত। হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। হজ্জের আভিধানিক অর্থ হল সংকল্প বা ইচ্ছা করা। শরীয়তে যথাযথ বিধান অনুযায়ী কাবা শরীফের যিয়ারতের (দর্শনের) উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "কাবা গৃহের হজ্জ সেসব লোকের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা সেখানে যাবার যোগ্যতা রাখে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৮) এই আয়াত থেকে বুঝা যায় প্রত্যেক সামর্থ্যবান লোকদের হজ্জ করা ফরয। মহানবী (সা.) বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি হজ্জ পালন না করলো, সে ইহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নেই। (তিরমিযী)।

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত রসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর। এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য? হুযূর (সা.) বললেন, যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত। আর যদি ফরয হয়ে যেত, তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতে না। (আহমদ, নেশাই ও দারেমী) এথেকে বুঝা যায় সামর্থ্য থাকা লোকদের জন্য হজ্জ জীবনে একবার পালন করা উচিত। আর যে অধিকবার হজ্জ করে, সেটা তার নফল ইবাদতে শামিল হবে। হাদীসে আরো আছে, কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি অসুস্থতার কারণে হজ্জ পালন করতে না পারে, তবে সে অন্য কাউকে দিয়েও হজ্জ পালন করাতে পারবে।

আমাদের সমাজে অনেক বৃত্তবান লোক রয়েছে, যারা সামর্থ্য রাখে কিন্তু হজ্জ পালন করে না। আবার অনেকে আছে লোকদের দেখানোর জন্য হজ্জ পালন করে থাকে। লোক দেখানো হজ্জ মূলত প্রকৃত হজ্জ নয়। হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জন করা। আমার মধ্যে যেসব আচরণ খারাপ তা বর্জন করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, হজ্জ অর্থ এই নয় যে, তারা ন্যায় ও অন্যায় পথে অর্থ উপার্জিত অর্থ দ্বারা সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পদান করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও ভঙ্গিতে নিয়োজিত হবে। এজন্য প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রত্যাশিত রূপ। (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ)

হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের ভালভাবে জানা উচিত। যারা হজ্জ পালন করে এসেছে, তাদের উচিত হজ্জের নিয়ম কানুন মেনে চলা, আর যারা এ বছর হজ্জে যাচ্ছেন তাদেরও উচিত কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই যেন হয় এ যাত্রা। তবেই আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত হজ্জ পালনকারী হিসেবে মনে করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে হজ্জের গুরুত্ব বুঝার এবং সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের হজ্জ পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ
তেবাড়িয়া, নাটোর

বাহ্যিকভাবে কাবা প্রদক্ষিণে কোন মূল্য নেই

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছিলেন, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর। এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য? হুযূর (সা.) বললেন, যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত। আর যদি ফরয হয়ে যেত, তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতে না। হজ্জ একবার। যে তার অধিক করল সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল। (আহমদ, নেশাই ও দারেমী)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৯৪ সনের ২১ মে ঈদুল আযহিয়ার খুতবায় হজ্জের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "একটি হজ্জ তো বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হজ্জ, যে সময় বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করার জন্য যায়। আপনারা এর যে নামই রাখুন না কেন, কিন্তু হজ্জ যাত্রীদের মাথায় খোদাকে সন্তুষ্ট করার চিন্তাই প্রধান্য লাভ করে থাকে।

অতএব, যে ধর্মে, যে জাতির মধ্যেই, ভূপৃষ্ঠের অংশে খোদার খাতিরে কোন পবিত্র স্থান দর্শন করা হয় এর জন্য জরুরী এই যে, ঐসব সুন্দর গুণাবলীই অবলম্বন করে যেন সেখানে যাওয়া হয় আর এটা পথের ঐ সম্বল যার ফলে তোমাদের যাত্রা সার্বিক ভাবে মঙ্গলজনক হবে। যদি পথে ঐ সম্বল না থাকে এবং বাহ্যিক ভাবে ঐ পবিত্র স্থানের নাম মক্কাই বা কা'বা বা কাশী, মথুরা যে নামই রাখো, প্রকৃতপক্ষে তা খোদার সমীপে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে না।

সুতরাং খোদা মানবমন্ডলীকে সমবেত করার জন্য হজ্জ পালন কালে আমাদের জন্য এক অনুশীলন, একটি সংগ্রাম ও সাধনা নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যাশা করে যে, তার হজ্জ গ্রহণীয় হোক, তাহলে তার ঐসব কর্ম

সম্পাদন করা উচিত, যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে, মানবমন্ডলীর একত্রীকরণের লক্ষ্যে সাধিত হয়। আর এ দিক থেকে উম্মতে ওয়াহেদার ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার কাজ সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন– 'কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সান্নিধানে হাজির হয়, কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খলা মুক্ত হয়ে পড়ে।

একজন হাজী বাহ্যিকভাবে কাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ের ভিতর স্বর্গীয় প্রেমের অগ্নি প্রজ্জলিত আছে এবং সত্যিকারের প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে।" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা, মূল রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্‌স্ ষষ্ঠ খন্ড, ১৯০৭)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং কোন ঝগড়া-বিবাদ না করে তবে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছিল (অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)। (বুখারী, মুসলিম)

হজ্জের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন– যারা হজ্জব্রত পালনের জন্য ব্রতী হয়ে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক লোকই লোকে তাদের হাজী বলুক এর জন্যই অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কাবাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না, কেননা, তারা শাসবিহীন খোলস মাত্র।" (১৯০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্‌স ৬ষ্ঠ খন্ড ১৯০৭)।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রকৃত অর্থে হজ্জের গুরুত্ব বোঝার তৌফিক দান করুন এবং হজ্জকারীদের হজ্জ কবুল করুন, আমীন।

মিলা পাটোয়ারী
আহমদনগর, পঞ্চগড়

যে হজ্জ নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে না সে হজ্জ বৃথা

ইসলামী ইবাদতগুলোর মধ্যে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান রাব্বুল আলামিনকে ভালবাসার উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জিলহজ্জ মাসের ৮ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কাবা এবং কয়েকটি বিশেষ স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী জিয়ারত, তাওয়াফ, অবস্থান করা এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। পবিত্র কুরআনে এই ইবাদত সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ রয়েছে- 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা সেসব লোকের জন্য ফরজ, যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে এটা অস্বীকার করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ জগৎসমূহের মোটেও মুখাপেক্ষি নন' (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)।

মহান আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হজ্জ করার সামর্থ দান করেছেন, হজ্জ পালনের উদ্দেশ্য তাদের কেবল এটাই হওয়া চাই যে, আল্লাহ্‌কে লাভ করা এবং তার সাথে গভীর প্রেমের এক সম্পর্ক যেন তৈরী হয় আর পূর্বের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মু'মিন-মুত্তাকী হয়ে যেন বাকী জীবন অতিবাহিত করতে পারে। যদি এমনটি হয় যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে পূর্বের মতই জীবন পরিচালিত করতে থাকে, তাহলে তার হজ্জ করা আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য রাখে না। আল্লাহ্ মানুষের হৃদয় দেখে থাকেন, কে কোন নিয়তে হজ্জ করতে আসেন, তা আল্লাহ্ ভাল জানেন।

যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২০১২ সালের ঈদুল আযহার খুতবার একাংশে বলেছিলেন 'লোক দেখানো হজ্বেও যাওয়া হয়। এটা আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, কার হজ্ব গ্রহণ হচ্ছে আর কারটা নয়। হজ্জ পালনের ক্ষেত্রে আহমদীদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন, যে আহমদীদের হৃদয়ে হজ্জ করার জন্য ব্যকুলতা রয়েছে আর হজ্জ করতে যেতে পারছে না, তাদের হজ্জ গ্রহণ হচ্ছে, না তাদেরটা, যাদের অধিকাংশই জুলুম ও অন্যায় করে হজ্জে চলে যায়।'? অনেকে এমনও রয়েছেন যারা একাধিকবার হজ্জ করেন আর কয়েকবার হজ্জ করা সত্ত্বেও তার মাঝে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না, যেমন পূর্বে ছিল তেমনি থেকে যায়। হজ্জ সম্পর্ণ করে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তনই যদি না আসে তাহলে এ হজ্জ বৃথা।

যে সকল স্থানে হজ্জের কার্যাবলী পালন করতে হয় তা হলো-কাবাগৃহ, হাতিম, হাজরে আসওয়াদ, মুলতাযাম, রুকনে ইয়ামেনী, মুতাফ, মাকামে ইব্রাহীম, যমযম, মসজিদুল হারাম, সাফা ও মারওয়া পাহাড়, মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত।

হজ্জের তিনটি অবশ্য পালনীয় কর্ম রয়েছে। এগুলো হলো- ইহরাম অর্থাৎ নিয়ত করা, উকূফে আরাফাহ-অর্থাৎ ৯ যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান এবং তোয়াফে যিয়ারত যাকে তোয়াফে ইফাযাও বলা হয়। অর্থাৎ সে তোয়াফ যা আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্জ অথবা এর পরবর্তী তারিখগুলোতে কা'বা গৃহে করা হয়ে থাকে। ৯ যিলহজ্জ যদি কোন ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান না করতে পারে তাহলে তার হজ্জ সম্পন্ন হবে না। তাকে পুনরায় পরবর্তী বছর ইহরাম বেঁধে হজ্জ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা সকল হজ্জকারীদের হজ্জ গ্রহণ করুন, এটাই আমাদের কামনা।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

বৃদ্ধ পিতামাতার সেবাযত্ন করাও হজ্জের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ

হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে শরিয়তের নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট সময়ে কা'বা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থান সমূহ জিয়ারত করাকেই হজ্জ বলা হয়। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হলো হজ্জ। হজ্জ হলো দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত এবং শ্রম সাধ্য ব্যাপার। তাই হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম ইবাদত-গৃহ হলো "কাবা"। হযরত আদম (আ.) এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই ইবাদত গৃহটি যখন নিশ্চিহ্নের পথে গিয়েছিল তখন আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে এই সুপ্রাচীন ইবাদত গৃহটিকে পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন"–অর্থাৎ হজ্জের ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে ইব্রাহীম এ আদেশ কেবলমাত্র তোমার জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য'। পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ অবধি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলাম ধর্মানুসারীগণ পবিত্র এ কা'বা শরীফে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে আসছে যা সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হজ্জের আরো একটি প্রধান শিক্ষা হলো মুসলমানদের অন্তরে কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করা ফলে বিশ্বের নানান বর্ণের মুসলমানগণ বিশ্বশান্তির পথকে সুগম করার সুযোগ লাভ করে। হাদীস তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, "সামর্থ্য থাকা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ আদায় না করে তা হলে সে ইহুদী কি খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নোই।"

হজ্জ কুরবানীর সংকেত প্রদান করে। এটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান। যার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যই হলো সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ককে ছিন্ন ও চূর্ণ করে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা! সমস্ত পার্থিব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে উৎসর্গ করাই হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই যদি কেউ স্বপ্নে হজ্জ করতে দেখে তাহলে এর তাবির হলো "উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া"। আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই তো মানব জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "ইসলামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে একটি ভেড়া যেমন কুরবানীর জন্য নিজেকে সমর্পণ করে, তদ্রুপ মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট তার যাবতীয় ইচ্ছা, অনুরাগ বিসর্জন দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। তেরশত বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মু'মিন বান্দা নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিতো। আর সেটাই হলো প্রকৃত "বড় ঈদ"। মূল কথা হলো বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনের ভাবই গুরুপত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক হাজী তার সকল বাহ্যিক পোষাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়, কারণ তখন সে সকল শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে।" (মলফুযাত)

হযরত ওয়ায়েস কূরনী (রা.)-এর সময়ে সেই বছরে হজ্জে হাজীর শুভাগমন ঘটেছিল। আল্লাহ্ পাক জনৈক হাজীকে ইলহামের মারফত জ্ঞাত করলো যে, এ বছর মাত্র একজনের হজ্জ কবুল করা হয়েছে! খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, যার কথা জানানো হয়েছে, তিনি কিন্তু সে বছর হজ্জেই যেতে পারেন নাই। আরো খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ঐ ব্যক্তি সারা জীবন জুতা সেলাই করে সংসার চালিয়েও এর মধ্য থেকে হজ্জে যাবার নিয়তে যে অর্থ জমিয়েছিলেন হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে প্রতিবেশীর অসুখের চিকিৎসার জন্য জমাকৃত সমুদয় অর্থ দিয়ে দিলেন প্রতিবেশীকে। চিন্তা করে দেখলো যে, যদি বেঁচে থাকি আগামী বছর আবার চেষ্টা করবো হজ্জে যেতে, কিন্তু বিনা চিকিৎসায় প্রতিবেশীর মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কি জবাব দেবো? কাজ করেছেন হাত দিয়ে কিন্তু অন্তর তার সর্বদা যিক্‌রে-ইলাহীতে রত ছিলো।

এজন্যই দয়ালু খোদা তার হজ্জ কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। নিয়তই তো হল মূল কথা। দুনিয়ায় এমনো লোক আছে নানান ভাবে উপার্জিত অর্থ জমিয়ে হজ্জ করতে যায় এবং "হাজী" নামে নিজেদেরকে সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে! কিন্তু রিয়া বা লোক দেখানো কাজকে আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না।

মূলকথা হলো হজ্জযাত্রী তার যাবতীয় পার্থিবতা বিসর্জন দিয়ে খোদার ভালবাসা ও ভক্তিতে নিমজ্জিত হবে। আল্লাহ্‌র প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পুর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করা তারই প্রকাশিত রূপ। বৃদ্ধ পিতামাতা বেঁচে থাকলে তাঁদের সেবাযত্ন করাও হজ্জের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। হজ্জের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তাক্‌ওয়া অর্জন করা। অতএব ইসলাম ধর্মে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্!

চেষ্টা সাধানার মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করে আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে মক্কায় পৌঁছে কাবা শরীফ জিয়ারত করার সংকল্প বাস্তবায়ন করা ও ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যাবতীয় অনুষ্ঠানাধি সম্পাদন করাই হজ্জ। ইসলামে যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে তার মধ্যে হজ্জ অন্যতম একটি। কাবাকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র ঘর বলা হয়। ঘর বলতেই আশ্রয়, নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্তির আবাস বুঝায়। আর আল্লাহ্‌র ঘর সেতো সমগ্র মানবজাতির জন্যই শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও চিরস্থায়ী উন্নতির মাধ্যম যা পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে।

কাবা সেই পবিত্র আদি গৃহ যা বাক্কা বা মক্কাতে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত হয় এবং পরে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) যা পুন:নির্মাণ করেন এবং যে মহান নবীর আগমনের জন্য দোয়া করেন তিনি হলেন মানব জাতির জন্য সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যিনি আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে, অনুসারীদের পবিত্র করবেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন। যার আগমনের মাধ্যমে দীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও চিরস্থায়িত্ব লাভ করেছে।

হজ্জব্রত পালন করা ফরজ। শর্ত হল সাবলক হতে হবে, সংসার নির্বাহের পর প্রয়োজনীয় পথ খরচ থাকতে হবে এবং মহিলাদের জন্য বৈধ অভিভাবক বা সঙ্গী থাকতে হবে এবং অবশ্যই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। সামর্থবানদের জীবনে অন্তত একবার হজ্জব্রত পালন করতে হয়। ইহা অবশ্যই পালনীয়। পবিত্র হজ্জব্রত পালন করা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করার নামান্তর।

অতএব তার জন্য প্রস্তুতিও সে রকমই হওয়া চাই। একজন হজ্জ যাত্রীকে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। নিজেকে সংসার মুক্ত ও ঝামেলা মুক্ত করার প্রস্তুতি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র হজ্জের মাধ্যমে কাবা শারীফ পরিণত হয় বিশ্ব মিলন কেন্দ্রে। কাবাতে পৌঁছার পূর্বেই নির্দিষ্ট স্থান থেকে আরম্ভ হয় হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার, আর তা ইহরাম বাধা থেকে শুরু হয়। ইহরাম হল সেলাই বিহীন দু'টি চাদর, যার একটি পরিধান করতে হয় এবং অন্যটি গায়ে জড়াতে হয়। এ হল নিজেকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করা।

ইহরাম অবস্থায় তালবীয়া পাঠ করতে হয় এবং নিজেকে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করতে হয় "উপস্থিত হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, আমি উপস্থিত; নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং অশেষ অনুগ্রহের তুমিই মালিক এবং আধিপত্যেরও। তোমার কোন অংশীদার নেই"। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে তোয়াফ বা পবিত্র কাবা গৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা এবং প্রতি চক্কর শেষে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) চুম্বন করা এবং ভীড়ের কারণে সম্ভব না হলে ইশারায় চুম্বন করার নিয়ম আছে।

৯ই যিলহজ্জ সূর্য্য ঢলে পড়ার পর হতে সর্য্যাস্তের পর পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরজ। আরাফাতে যাওয়ার পূর্বে মীনাতে অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নত। আরাফাত হতে মীনায় ফেরার পথে 'মাশারাল হারাম' পাহাড়ের পাদদেশে মুজদালিফায় রাত্রি যাপন ও সেখানে মাগরীব ও ইশার নামায জমা করে পড়া নিয়ম। ১০-১২ অথবা ১৩ই যিলহজ্জ মীনায় থাকতে হয়। জমারাতুল আকাবা, উলা ও উসাতে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে মীনাতে কুরবানী করতে হয় এবং পরে মস্তক মুন্ডন রীতি। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার প্রায় সব কিছুই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

আসলে সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয়ে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ করার মধ্যেই হজ্জের গুরুত্ব। মূলত: কাবা কেন্দ্রিক, বিশ্ব-ঐক্য, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব নিরাপত্তার রূপ রেখা নিহিত। পরিপূর্ণভাবে হজ্জব্রত পালন করার পর একজন হাজী নবজাতক শিশুর মতই নিস্পাপ ও পবিত্র হয়ে যান। তাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও মাগফেরাত লাভের জন্য ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান
বড়চর হবিগঞ্জ

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। মসজিদের সাথে কেমন হবে আমাদের সম্পর্ক।

২। সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পবিত্র রমযান ও ঈদ-উল-ফিতরের বিভিন্ন কর্মসূচী সফলতার সাথে সম্পন্ন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক গত রমযান ও ঈদ-উল-ফিতরে বিভিন্ন কর্মসূচী অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়। পবিত্র মাহে রমযানে সারা মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। রমযানে জামা'তের ৫ টি হালকার ৫ টি স্থানে তারাবী নামায আদায় করা হয়। যার গড় উপস্থিতি ছিল প্রত্যহ ৪০০ জন। ৫ টি হালকায় ৪টি স্থানে দরসে কুরআন ও ইফতারীর ব্যবস্থা ছিল, যার গড় উপস্থিতি ছিল ৩০০ জন।

৪টি স্থানে সুষ্ঠুভাবে কুরআন পাঠের ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল যার গড় উপস্থিতি ছিল প্রত্যহ ৪০/৫০ জন। এছাড়া সারা রমজান মাস ব্যাপী তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা উত্তোলন করা হয়। উত্তোলনের হার শতকরা ৯৮ ভাগ। এ ছাড়া ২১৮ জন মৃত্যু ব্যক্তির নামে তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করা হয়। রমযান মাসে অত্র জামা'তের ২১০ জন সদস্য/সদস্যা কুরআন খতম করে এর মধ্যে ১৪ জন ২ বার, ৩ জন ৩ বার, ২ জন ৪ বার করে এবং ৪ জন অর্থসহ কুরআন খতম করেছে।

জামা'তের ২টি হালকা আহমদীপাড়া ও মৌড়াইলে মোট ১০ জন রমযানে এতেকাফ করেছেন। এতেকাফকারীদের মাঝে এবং রোগীদের মাঝে রমযানে জামা'তের পক্ষ থেকে তৌফা হিসাবে ফল বিতরণ করা হয়।

২৯ রমযান ৫ টি হালকা একত্রীভূতভাবে বাইতুল ওয়াহেদ মসজিদে ইজতেমায়ী দোয়া ও ইফতারীর ব্যবস্থা করা হয়, যার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৮০০ জন ।

ঈদ-উল-ফিতরের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। যার মধ্যে ছিল মসজিদ সাজ সজ্জা করা, ঈদ ফান্ড আদায়, ওয়াকারে আমলের কাজ, ঈদের নামাযের পর কবর জিয়ারত ও ইজতেমায়ী দোয়া করা। ঈদের নামায ও কবর জিয়ারতের পর আছর পর্যন্ত ৫ টি হালকায় ১০ টি টিম প্রত্যেক আহমদীর ঘরে ঘরে গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিশুদের মাঝে চকলেট বিতরণ করে। এছাড়া রোগী ও বুজুর্গদের সাথে সাক্ষাত করা হয়।

সারাদিন ব্যাপী ঈদের বিভিন্ন কর্মসূচী পালন শেষে মসজিদুল মাহ্‌দীতে আছর নামায আদায় করা হয়। নামাযের পর মরহুম হযরত মওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে সারাদিন ব্যাপী কর্মসূচি শেষ হয়। উক্ত কর্মসূচিতে ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫-০৮-২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন সোহানা আফরোজ, হাদীস পাঠ করেন কামরুন্নাহার নিশি, আহাদনামা পাঠ করান বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। তরবিয়তের গোড়ার কথা বই এর ওপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন আফরোজা মতিন, স্নিগ্ধা রহমান এবং আমাতুস সামী। সবশেষে তরবিয়তী বক্তব্য প্রদান করেন নাছিমা বশির। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত তরবিয়তী সেমিনারের সমাপ্তি হয়। উক্ত সেমিনারে ৫৫ জন লাজনা ও ১৬ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ২১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৮/২০১৪ তারিখ রোজ রবিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ২১তম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টা থেকে ১.০০টা পর্যন্ত চলে।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুস্ সামী। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর।

আহাদ নামা পাঠ করান প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। হাদীস পাঠ করেন নুসরত জাহান ঐশী, নযম পাঠ করেন ফায়জা সুলতানা ইমা। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। সন্তানদের তরবিয়তে মায়ের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন নিশাত জাহান রজনী। এরপর রিপোর্ট পেশ করেন সেক্রেটারী মাল।

এরপর লাজনাদের নযম, কাসিদা ও কুইজ প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং নামায ও দুপুরের খাবারের পরে ৩ টা থেকে দ্বিতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন তামান্না হাছিন ও নযম পাঠ করেন আমাতুস সামাদ তানিয়া। নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন রেজোয়ানা করিম। নযম পাঠ করেন তালাত মেহতাব রত্না। ওসীয়্যত ও মালী কুরবানী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নাছিমা বশির, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি।

পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে প্রায় ৪০০জন উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৫ম বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ–২০১৪ সফলতার সাথে পালিত

গত ১লা আগষ্ট ২০১৪ হতে ৭ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৫ম বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ–২০১৪ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে সফলতার সাথে পালিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ১লা আগষ্ট বাদ মাগরীব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ কায়েদ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের পর সভাপতি কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর স্বাগত ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব আবির আহমদ চাঁদ, নাযেম আতফাল এবং জনাব আবু তালেব, যয়ীমে আলা, আনসারুল্লাহ্। ৭ দিন ব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন হয়, যেমন কুরআন তেলাওয়াত, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, গণিত পরীক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

কর্মসূচীর আকর্ষণীয় বিশেষ দিক ছিলো ২টি শিক্ষা সফর। কর্মসূচির ২য় দিনে ০২/০৮/২০১৪ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকা সরাইল ধরন্তি, ভৈরব চীন মৈত্রী সেতু, আশুগঞ্জ দেশের বৃহত্তর রেল সেতু পরিদর্শন করা হয়। এবং কর্মসূচির ৫ম দিনে (৫/৫/২০১৪) কুমিল্লায় শিক্ষা সফর করা হয়। মাইক্রোবাসে করে কুমিল্লার দর্শনীয় স্থান ময়নামতি জাদুঘর, বৌদ্ধবিহার, শালবনবিহার, চিড়িয়াখানা, বোটানিকেল গার্ডেন, ১৯৪৫ সনে ২য় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের সমাধিক্ষেত্র ওয়ার সিমেট্রি এবং মাশরুম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় আতফালদের প্রত্নতাত্ত্বিক নানা বিষয় সহ অনেক কিছু দেখানো হয় ও বুঝানো হয়, মাশরুমের পুষ্টি গুণাগুণ, এর চাষ পদ্ধতি, সরেজমিনে দেখানো ও বুঝানো হয়।

আতফালদের বিনোদন ও শিক্ষা আহরণে এ বছর আয়োজিত ২ টি সফরে ২২ জন অংশগ্রহণ করে, তন্মধ্যে কুমিল্লা সফরে কায়েদ সাহেব কুমিল্লা সহযোগিতা করেন। সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের কারণে কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ আগষ্ট বাদ মাগরীব জুয়েল আহমদ, জেলা কায়েদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম স্থান অধিকারী আতফালদ্বয় যথাক্রমে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করে। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোশারফ হুসেন, মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম এবং জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ-এর সমাপনী ভাষণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মসূচি আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সার্বিক কর্মসূচিতে ৭৮ জন আতফাল, ৬ জন খোদ্দাম, ৬ বিচারক মন্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেয়ালিকা প্রকাশ

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর '১৪ উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পক্ষ থেকে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। "আল মাহ্দী" শিরোনামে দেয়ালিকাটিতে কুরআন, হাদীস, মলফুযাত, নযম, স্বাস্থটিকা, হাসির হাট, ধাঁধা, কৌতুক, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর অমৃতবাণী এবং যুগ খলীফাগণের বাণী, মজলিসের খবর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়াদি দিয়ে সাজানো হয়। ঈদের দিন বাদ ফজর দোয়ার মাধ্যমে দেয়ালিকাটি উন্মোচন করা হয়।

আকবর আহমদ সোহাগ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২/০৮/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে ৪র্থ স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। উদ্বোধনী ও স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট মোসাঃ সেলিনা আক্তার। এরপর জেনারেল সেক্রেটারী বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। ইজতেমায় ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বিকালে সমাপ্তি অধিবেশন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে স্থানীয় আমেলার সদস্যাগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ৪র্থ স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলী

পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষ্যে মিরপুর জামা'তের বিশেষ কর্মসূচি সফলতার সাথে সম্পন্ন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরে মাহে রমযান উপলক্ষে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়: দরসে কুরআন ঃ প্রতিদিন বাদ আসর থেকে ইফতরির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দরসে কুরআানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দরসে কুআনের সময় স্থানীয় আহমদীগণ ছাড়াও জেরে তবলীগ ও গয়ের আহমদী ব্যক্তিগণও উপস্থিত ছিলেন। ইফতারীর ব্যবস্থা ঃ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মিরপুর জামা'তে ইফতারির ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ১৫০ জন (লাজনা সহ) রোযাদার ইফতারিতে অংশগ্রহণ করেন। ইফতারীর জন্য অনুদান প্রেরণ ঃ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজল ও রহমতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদন ক্রমে মিরপুর জামা'ত অন্যান্য জামা'তের অসচ্ছল ভাইদের ইফতারিতে শরীক করার নিমিত্তে ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করে। আলহামদুলিল্লাহ্!

খতম তারাবীহ নামাযের ব্যবস্থা ঃ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মিরপুর জামা'তে খতমে তারাবীহ নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। মৌলবী হাফেয আবুল খায়ের সাহেব তারাবীহ্ নামাযে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিদিন লাজনাসহ প্রায় ৭০-৮০ জন তারাবীহ নামাযে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মিরপুর জামা'তের আওতাধীন কাজীপাড়া হালকায় জনাব আবুল হোসেন পাটোয়ারী সাহেবের বাসায়, আহমদনগর হালকায় জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বাসায় ও জনাব আমীর মোহাম্মদ খাঁন সাহেবের বাসায়, উত্তর বাহের চর হালকা মসজিদ সহ মোট (পাঁচ) স্থানে বাজামাত তারাবীহ নামায আদায় করা হয়।

ঈদের তোহ্ফা ঃ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজল ও রহমতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মিরপুর জামা'ত অসচ্ছল আহমদীদের ঈদের আনন্দে শরিক করার লক্ষ্যে বিশেষ তোহফা বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ৮০ টি পরিবারের মধ্যে তোহফা বিরতণ করা হয়। প্রতি প্যাকেটে পোলাউর চাউল, তেল, চিনি, সেমাই, ঘি ও দুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এছাড়াও ৬১ টি পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় ঃ বিগত বছরের ন্যায় এবারও তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা আদায়ের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়। ২৫ রমযানের মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ এর চাঁদা আদায়কারীদের নামের তালিকা হুযূর (আই.) এর খেদমতে দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়।

তালিম ও তরবিয়তী কার্যক্রম ঃ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর এর অংগ সংগঠন সমূহ রমযান মাস ব্যাপী বিভিন্ন ধরণের তালিম ও তরবীয়তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। যেমন ওয়াকফে নও ক্লাস, কুরআন নাযেরা, অর্থ সহ নামায ও বিষয় ভিত্তিক কুরআনের আয়াতের অর্থ শিক্ষা ইত্যাদি। কুরআন খতম ঃ রমযান মাস উপলক্ষে বেশী বেশী আহমদী যেন কুরআন খতম করেন সেজন্য সকলকে উৎসাহিত করা হয়, যার ফলে মিরপুর জামা'তের প্রায় ৬০ জন সদস্য কুরআন খতম করেন। ইতেকাফে অংশগ্রহণ ঃ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে মিরপুর জামা'তের ১৪ জন সদস্য রমযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ঈদের দিনের কর্মসূচি ঃ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঈদের জামা'ত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের নামায শেষে সকলকে মিষ্টিমুখ করা হয় এবং শিশুদের মাঝে ৩০০ (তিন শত) প্যাকেট তৌফা বিতরণ করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর ঐশী সিলসিলার বেশী বেশী খেদমত করার তৌফিক দিন, আমীন।

বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী

খোদ্দামুল আহমদীয়ার দশম বার্ষিক জেলা ইজতেমা ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ খোদ্দামুল আহমদীয়ার দশম বার্ষিক জেলা ইজতেমা ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় রাজশাহী, তাহেরাবাদ, বাগমারা, পাবনা, নূরনগর-এর আতফাল ও খোদ্দামগণ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে জনাব মোহাম্মদ ফারুক ইজতেমায় যোগদান করেন। এছাড়া রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, জেলা কায়েদ জনাব রাজিব আহমদ, জনাব ড. আব্দুল্লাহ শামস্ বিন তারেক, মওলানা মোহাম্মদ সালাহ্ উদ্দিন আহমদ, মৌলবী ফরহাদ হোসেন এবং মোহাম্মদ নোবেল ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ তৌফিক জামান এবং নযম পাঠ করেন কনক আহমদ। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ইজতেমায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ২৩ আগষ্ট ২০১৪ বিকালে ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকর্তাগণ নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন। পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে মোট ৭০ জন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য এবং ৬ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

ইজতেমায়ী কুরআন খতম অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে গত ২৫ জুলাই ২৬ রমযান রোজ শুক্রবার ইজতেমায়ী কুরআন খতম অনুষ্ঠান হয়। কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথমে আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনার পর ৩৪ জন আতফাল কুরআন খতম করেন। তন্মধ্যে ২৮ জন আতফাল প্রত্যেকে এক পারা করে কুরআন পাঠ করেন এবং বাকী আতফাল মিলে ২ পারা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মজলিসের পক্ষ থেকে ইজতেমায়ী কুরআন খতম অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন নাযেম আতফাল আবির আহমদ চাঁদ ও এডিশনাল নাযেম সেহেতে জিসমানী কামরুল ইসলাম।

ইজতেমায়ী খতম শেষে প্রত্যেকেই কুরআন খতমের দোয়া পাঠ করেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

শ্যামপুরে লাজনা ইমাইল্লাহর ৭ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৮/২০১৪ তারিখে কেন্দ্রের অনুমতিক্রমে লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরে ৭ম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা পালন করা হয়। ইজতেমার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সালমা জাকির। নযম পরিবেশন করেন ঐশী ও মুন। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট, জাহানারা আহমদ। শুভেচ্ছা ভাষণ প্রদান করেন ইজতেমার চেয়ারম্যান সামুরা হোসেন। উক্ত ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষা ও বক্তৃতা সহ কুইজ এর প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ইজতেমায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জামা'তের সদস্যা আনোয়ারা সিকদার,জ্যোৎস্না বশির ও স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট জাহানারা আহমদ। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপর জনাব খলিলুর রহমান সাহেবের বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়। উক্ত ইজতেমায় ৩০ জন লাজনা, ৮ জন নাসেরাত, ১৮ জন মেহমান ও ১০ জন ত্রিফল উপস্থিত ছিলেন।

লুৎফা আহমদ

ঢাকার শান্তিনগর হালকায় ঈদপুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০৮/২০১৪ তারিখ ঢাকার শান্তিনগর হালকার সদস্যদের নিয়ে ঈদপুনর্মিলনী পশ্চিম রামপুরাস্থ বাবু সাহেবের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১০ জন সদস্য তাদের ঈদ উদযাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এছাড়া সকলকে হুযূর (আই.)-এর তারহরীকসমূহের ওপর আমল করার জন্য তাকিদ করা হয়। সবশেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয় যাতে সম্প্রতি পাকিস্তানের গুজরানওয়ালাতে শহীদদের জন্যও দোয়া করা হয়। এতে হালকার প্রেসিডেন্টসহ আমেলার সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা নাটোর, তেবাড়ীয়া জামা'তের সদস্য জনাব আব্দুর রশিদ বেগ, পিতা-মৃত নূরুল ইসলাম বেগ, গত ১২/০৮/২০১৪ তারিখ বিকাল ৫-৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি জেলা তথ্য অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে ৩ সন্তান এবং ৫ মেয়েসহ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। ১৯৯৯ সালে তেবাড়ীয়া জামা'তে মোখালেফাতের সময় তিনি ঘরবাড়ীতে ঢুকতে পারেন নাই এবং অনেক মার খেয়েছেন। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনদের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিক
মরহুমের বড় ছেলে

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর ১৩তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৮/২০১৪ তারিখ রোজ রবিবার তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে দিনব্যাপী ১৩তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উজতেমা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি মোবারেকা জাহান, ওয়াকফে নও ইনচার্জ, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন তেজগাঁও জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ। ইজতেমার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এরপর স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব পর্দার আড়াল থেকে উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। আহাদনামা পরিচালনা করেন সৈয়দা কামরুন্নেসা।

বক্তৃতা পর্বে 'মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আয়েশা সিদ্দিকা। 'মালি কুরবানী ও চাঁদার খাত' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভিকারুন্নেছা লুনা। তিনি বছরের সাধারণ রিপোর্টও পেশ করেন। এরপর 'ইসলামে পর্দার গুরুত্ব' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন আরিফা রহমান। 'এতায়াতে নেযাম'-এর ওপর বক্তব্য রাখেন নুরুন্নাহার বেগম। প্রথম অধিবেশনের প্রত্যেক বক্তৃতার পর একটি করে নযম পরিবেশন করা হয়। নযম পেশ করেন যথাক্রমে তাছনীম এহসান ঐশী, নাফিছা মালিয়াত, উপমা, অর্পিতা ও সালেহা মরিয়ম। খাবার, নামায ও খেলাধূলার বিরতি চলে ১২-৩০ থেকে ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত। খাবারের দায়িত্বে ছিলেন জলি নূর, পারুল আক্তার এবং সফুরা বেগম।

ইজতেমার ২য় ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় আমেনা করিমের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। হাদীস ও মলফুযাত পাঠ করেন তানজিলা সিদ্দিকা। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন আতিয়াতুল ওয়াহিদ।

'নামাযের গুরুত্ব' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোবারেকা বেগম। আরবী কাসিদা পাঠ করেন অর্পা, পিয়ন্তী ও আরও অনেকে। একক নযম পেশ করেন ভিকারুন্নেছা লুনা। সবশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও নসিহতমূলক বক্তব্য এবং দোয়া পরিচালনা করেন তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার (শিখা)। ইজতেমায় খুব শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং সবাই মনযোগ দিয়ে ইজতেমার বক্তৃতাগুলো শ্রবণ করেন। পুরো ইজতেমা সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। ইজতেমা গাহ-এর এক কোনে জামা'তি বই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও নীচ তলায় স্টল দেয়া হয়েছিল। ছোট আতফালদের আসরে ছিল ইনতেছার, নূর উদ্দিন নাছের এবং আয়ান। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৭ জন লাজনা, ৩জন মেহমান, ১জন নওমোবাইন, ১৪জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

শারমিন আক্তার (শিখা)

সন্তান লাভ

গত ১০ জুন ২০১৪, রাত ১০:৩০ মিনিটে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একজন পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) দয়াপরবশ হয়ে তার নাম রেখেছেন নাদীম উর রহমান। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করছি। তার সাথে সাথে আমরা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেলাফত তথা আহমদীয়াতের সাথে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি তার জন্যও দোয়ার অনুরোধ করছি।

সিবগাতুর রহমান (মুকুল) ও আমাতুল সাদেকা

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

অষ্ট্রেলিয়ার বিগেষ্ট মর্নিং টি অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অষ্ট্রেলিয়ার অংশগ্রহণ

অস্ট্রেলিয়ার বিগেস্ট মর্নিং টি অনুষ্ঠান অস্ট্রেলিয়ার ক্যান্সার কাউন্সিল আয়োজন করে যা সবচেয়ে বড়, জনপ্রিয় ও সফল অর্থ সংগ্রহকারী অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অষ্ট্রেলিয়ার মানুষেরা একসাথে হয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। পরিসংখ্যানে জানা যায় ২ জন অষ্ট্রেলিয়ানের মধ্যে ১ জন ৮৫ বছরের আগেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। এই সমস্যা এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে বছরে একবার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ক্যান্সার কাউন্সিলের গবেষণা, প্রতিরোধ সাহায্যের জন্য দেয়া হয়।

এই কাউন্সিলের লক্ষ্য হল সফল প্রতিরোধ, উন্নত চিকিৎসা, সাহায্য সহযোগিতা এবং বিশ্ব খ্যাত গবেষণার মাধ্যমে ক্যান্সারের প্রকোপ কমিয়ে আনা।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার এই মহতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে যা ইসলামের মানবসেবায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সিডনি জামা'ত ৭ জুন ২০১৪ তারিখে ১৬৫ জন লাজনা ও ৫৫ জন নাসেরাত সদস্য খিলাফত শত বার্ষিকী হলে বিভিন্ন স্টলে খাবার বিক্রি করে এই লক্ষ্যে ৳ ২০০৯ সংগ্রহ করেছে।

একই রকমভাবে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া এবং ভিকটরিয়া জামা'তও এই মহতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া জামা'ত মসজিদ মাহমুদে ১৫ মে ২০১৪ তারিখে ৳ ৬১১ সংগ্রহ করে যার মাধ্যমে লাজনা ইমাইল্লাহ্ তাদের টি স্টল থেকে ৳ ৩১১ এবং জামা'ত বাকি ৳ ৩০০ সংগ্রহ করে। জামা'তের বাইরের সদস্যরা এতে অংশগ্রহণ করেন এবং এই অনুষ্ঠানে তাদের সমর্থন ও প্রশংসা করেন।

কানাডায় ঈদুল ফিতর উদযাপন

১৯ জুলাই ২০১৪, মঙ্গলবার, কানাডায় ঈদুল ফিতর উযাপিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে, জামা'তে আহমদীয়া কানাডা বছরের শুরুতেই ঈদের তারিখ ঘোষণা করেছিল। এর মূল উদ্দেশ্য হল, যাতে জামা'তের সদস্যরা আগে থেকে ঈদের ছুটির ব্যবস্থা করতে পারেন এবং বিপুল সংখ্যক সদস্য ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

টরেন্টো এয়ারপোর্টের নিকটস্থ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে, কানাডার বৃহত্তর ঈদের জামা'ত নামায অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে প্রতি বছর কানাডার জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টায় এবং নামায পরিচালনা করেন কানাডা জামা'তের আমীর জনাব লাল খান মালিক সাহেব। নর-নারী ও শিশুসহ নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮,০০০ জন।

বায়তুল ইসলাম মসজিদে কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তর ঈদের জামা'ত অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করা হয় তাহের হলে এবং পুরুষদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করা হয় বায়তুল ইসলাম মসজিদে ও মসজিদের বাইরে তাবু টানিয়ে। এখানেও ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১০টায়। ঈদের খুৎবা প্রদান করেন পীস ভিলেজ-এর মিশনারী মওলানা ফারহান ইকবাল সাহেব।

ঈদের নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫,৩৫০ জন। বায়তুল ইসলাম মসজিদের নিকটস্থ, পীস ভিলেজের সদস্যদেরকে পায়ে হেঁটে মসজিদে যেতে অনুরোধ করা হয়, যাতে করে দূর থেকে আগত সদস্যদের গাড়ী পার্কিংয়ের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং এখানে প্রায় ১,৭০০ গাড়ী পার্ক করা হয়। জামা'তের সদস্যদের সুবিধার্থে, বেশকিছু টেবিল স্থাপন করা হয়, যাতে তারা সহজেই ঈদ ফান্ড এবং ফিতরানা পরিশোধ করতে পারেন।

কানাডার বিভিন্ন মসজিদে একই ভাবে ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়। কানাডার রাজধানী অটোয়ার, বায়তুন নাসের মসজিদে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০ জন। অটোয়ার মিশনারী মওলানা ইমতিয়াজ আহমদ সারা সাহেব নামায এবং ঈদের খুতবা পরিচালনা করেন। কানাডার পশ্চিমাংশ, এডমন্টনের বায়তুল হাদি মসজিদ ছিল তার ধারণ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ এবং উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪,৫০ জনের ওপরে। এখানে এডমন্টন-এর মিশনারী মওলানা সৈয়দ তাহা সাহেব ঈদের খুতবা এবং নামায পরিচালনা করেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ জার্মানির ৩৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৩০, ৩১ মে এবং ১লা জুন জার্মানির ডেবারগ শহরে মজলিস আনসারুল্লাহ্, জার্মানি তাদের ৩৪তম বার্ষিক ইজতেমার আয়োজন করে। বিপুল সংখ্যক আনসার এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কিছু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফালও অংশগ্রহণ করে বলে জানা যায়।

মওলানা হায়দার আলী জাফর সাহেবের পরিচালনায় ৩০ মে, শুক্রবার জুমআর নামাযের পরপরই উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। জার্মানির আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়। এ সময় আনসারদের দায়িত্ব সম্পর্কে সভাপতি সাহেব আলোকপাত করেন। শিক্ষামূলক এবং খেলাধূলা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও করা হয়। এতে সবাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটির মুখ্য বিষয় ছিল সাইকেল প্রতিযোগিতা। আমীর সাহেব নিজে সকল প্রতিযোগীকে স্বাগত জানান এবং উৎসাহিত করেন। এই অনুষ্ঠানে ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডের আমির সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

গত ১লা জুন জার্মানির আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন পাঠের মাধ্যমে সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উত্তম ফলাফলকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমাপনী ভাষণে মুখ্য অতিথি এবং আমির সাহেব, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন যে, খলীফার প্রতি পূরো অনুগত থাকার মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি বজায় থাকে। দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

অত্যন্ত সফলতার সাথে যুক্তরাজ্যের ৪৮তম সালানা জলসা সমাপ্ত

গত ২৯, ৩০ ও ৩১ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহ্‌দীতে অনুষ্ঠিত হয় ৪৮তম সালানা জলসা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর পূর্ণ হয় এ বছর, যার ফলে এ জলসা ছিল বিশেষ এক জলসা। এ জলসায় ৯৭ টি দেশ থেকে ৩৩ হাজার ২৭০ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা এবং মেহমানগণ অংশগ্রহণ করেন। এই উপস্থিতি গত বছরের তুলনায় ২ হাজারের অধিক। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে জলসার ৩ দিনই আবহাওয়া খুবই ভাল ছিল। জলসার কার্যক্রম লাখো দর্শক এমটিএ-এর শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি শ্রবণ করেন এবং জলসার বরকত থেকে কল্যাণমন্ডিত হন। জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) জুমুআর খুতবা ছাড়াও ৪ টি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩১ আগষ্ট বাংলাদেশ সময় ৬-৩০ মনিটের দিকে আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)। হুযূর (আই.) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ঐতিহাসিক কোট পরিধান করে জলসাগাহে বয়আত অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য যখন প্রবেশ করেন তখন সবাই নারা লাগাতে থাকেন 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার' এই ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠে। হুযূর (আই.)-এর পবিত্র হাত স্পর্শ করে সবাই একে অপরের ঘারের ওপর হাত রেখে বয়আতের বাক্যগুলো পাঠ করেন। শেষে হুযূর (আই)-এর সাথে সাথে জলসাগাহের সব সদস্য এবং পুরো বিশ্বের আহমদী সিজদা শুকরের জন্য মাটিতে লুটিয়ে পরেন। এটি এক আধ্যাত্মিক দৃশ্য ছিল। এ বছর ৫ লাখ ৫৫ হাজার ২৩৫ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হন। এছাড়া দুটি নতুন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চারা রোপিত হয়। দেশ দু'টির নাম হলো ১। বেলিস ও ২। ইউরিগুয়ে।

জলসার কর্যক্রম শুরু হয় ২৯ আগষ্ট রোজ শুক্রবার রাত ৯:৩০ মিনিটে হুযূর (আই.)-এর পতাকা উত্তোলন ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে জনাব আব্দুল মুমিন তাহের সূরা আল ইমরানের ১৩৫-১৩৭ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ফার্সি নযম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ আশেক হোসেন। এরপর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আরবী কাসিদা পাঠ করেন জনাব রাশেদ খাতাব। এরপর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর উর্দু কালাম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ ইসমত উল্লাহ্। এরপর হুযূর (আই.) জলসার ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা তুলে ধরেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধনী অধিবেশ সমাপ্ত হয়।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ৩০ আগষ্ট রোজ শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ৩ টায় শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠ করা হয়। বক্তৃতা পর্বে 'বিশ্বে অশান্তির কারণ এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায়' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুবাশ্‌শের আহমদ আইয়ায সাহেব। এরপর 'আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ঈমানবর্ধক দৃষ্টান্তসমূহ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুবাশ্‌শের আহমদ কাহলুন সাহেব। এ পর্যায়ে একটি উর্দু নযম পাঠ করা হয়। এরপর 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে কৃত ঐশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও তার পূর্ণতা' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম ড. ইফতিখার আহমদ আইয়ায সাহেব।

মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.) বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায়। জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর হুযূর (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের এক বছরের অর্জনসমূহ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন ৩১ আগষ্ট রোজ রবিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ৩ টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। বক্তৃতা পর্বে 'আহমদীয়াতের ১২৫ বছরের ইতিহাস' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মি. টমি কালোন সাহেব। এরপর 'জামা'তের উন্নতি খেলাফতের সাথে বাঁধা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল মজিদ তাহের। জলসার এ পর্যায়ে একটি উর্দু নযম পাঠ করা হয়। এরপর 'পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আতউল মুজিব রাশেদ সাহেব। এরপর 'অমুসলিমদের সাথে মহানবী (সা.)-এর আচরণ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম রফিক আহমদ হায়াত সাহেব। আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান শুরু হয় বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে।

জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায়। প্রথমে বিশিষ্ট অতিথি বর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর কুরআন তেলাওয়াত এবং আরবী কাসিদা ও উর্দু নযম পাঠ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যারা সফলতা অর্জন করেছেন তাদের হাতে হুযূর (আই.) পুরস্কার তুলে দেন। এরপর আহমদীয়া আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়। এরপর হুযূর (আই.) জলসার সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

ডেস্ক রিপোর্ট

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 5th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th September, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com